মা-বাবা-ভাই-বোন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সাহিত্যম্

১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

বরুণ বকসী

প্রিয়বরেষু

মা-বাবা-ভাই-বোন

এক সময় সিঁড়িগুলো ছিল কত হালকা, তরতর করে ওঠানামা করা যেত। রেলিং-এর ওপরে ঝকঝকে পালিশ করা কাঠের হাতল। এখন সেই সিঁড়িগুলোই বুড়ো হয়ে গেছে। রেলিংটা নড়বড় করে। তিনতলা পর্যন্ত উঠতে আজকাল রীতিমতন পরিশ্রম হয় প্রিয়নাথের, সিঁড়িটাকে মনে হয় পাহাড়ী পথ, এক পা এক পা ফেলে মাঝে মাঝেই দম নেবার জন্য থামতে হয়। অথচ এক লাফে দু'তিন ধাপ সিঁড়ি টপকে যাওয়া, মনে হয় যেন এই সেদিনের কথা।

তিনতলায় উঠে, সিঁড়ির শেষ ধাপে পা দিয়ে প্রিয়নাথ একটুক্ষণ জিরিয়ে নিলেন। তারপর হাত দিলেন পাঞ্জাবির বোতামে। এই একটা পুরোনো অভ্যেস এখনো যায়নি, বাইরে থেকে বাড়ি ফিরে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই তিনি জামা খুলতে শুরু করেন, ঘরে ঢোকেন জামাটা হাতে ঝুলিয়ে, সেটাকে আলনায় ছুঁড়ে দিয়েই লুঙ্গিটা টেনে নেন। সঙ্গে সঙ্গে স্নানের ঘরে। সকালবেলায় ন'টা পর্যন্ত প্রিয়নাথের জন্য বাথরুম খালি রাখা চাই-ই।

পাশাপাশি দু'খানি বেশ বড় ঘর, ডানপাশে ছাদের সিঁড়ির পাশে আর একখানা ঘর একটু ছোট, মোট তিনখানি, এছাড়া রান্নাঘর, বাথরুম। তিনতলার পুরোটাই প্রিয়নাথদের, আলো হাওয়া প্রচুর, জলের যতই কষ্ট থাক, আলো হাওয়ার জন্য তা পুষিয়ে যায়। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রিয়নাথ ভাবলেন, যাক আর বেশিদিন এ সিঁড়ি ভাঙতে হবে না।

স্নান করতে যাবার আগে রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে প্রিয়নাথ বললেন, আজ বাড়ি ঠিক করে এলাম।

উনুনের ওপর কড়াইতে গরম তেল চড়চড় করছে, তাই কল্যাণী প্রথমে শুনতে পেলেন না। ঘামে ভেজা মুখখানি ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী?

প্রিয়নাথ বললেন, বাড়ি ঠিক করে এলাম। কিছু টাকা অ্যাডভান্সও দিয়ে এসেছি।

কল্যাণী সঙ্গে সঙ্গে উনুন থেকে নামিয়ে ফেললেন কড়াইটা। এটা একটা সাঙ্ঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, প্রায় অবিশ্বাস্য। অনেকক্ষণ ধরে শুনতে হবে, রান্নাবান্না এখন থাক।

একই সঙ্গে রাগ আর অভিমান মেশানো গলায় কল্যাণী বললেন, তুমি আগেই টাকা দিয়ে এলে? আমরা দেখলাম না শুনলাম না।

—হ্যাঁ, আবার হাত ছাড়া হয়ে যাক আর কি! মোটামুটি দু'খানা ঘর, এক চিলতে বারান্দা, সামনেই একটা কদমফুলের গাছ।

—ক'তলায়?

—এক তলায়।

বলেই প্রিয়নাথ মুচকি হাসলেন। এবার সত্যিই ভয় পেয়ে গেলেন কল্যাণী। সকালবেলা ন'টার সময় প্রিয়নাথের মুখে হাসি? বহুদিন কেউ দেখে নি। এই সময়ে তাঁর নিশ্বাস ফেলারও সময় থাকে না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান সাতটার আগে, টিউশানি করতে, ফিরতে ফিরতে ন'টা সওয়া ন'টা বেজে যায়, তক্ষুনি স্নান সেরে নিয়ে খেতে বসেন, উনুন থেকে রান্না সরাসরি চলে আসে তাঁর থালায়। ঠিক দশটা দশের মধ্যে তাঁকে আবার বেরিয়ে পড়তেই হবে। এর মধ্যে হাসির উপাদান কোথায়? তাছাড়া গত কয়েকমাস থেকে বাড়ি খোঁজার ঝামেলায় মেজাজ আরও খিঁচড়ে আছে।

—কত ভাড়া?

—এক শো পাঁচ টাকা।

—এক শো পাঁচ টাকায় দু'খানা ঘর? তুমি বলছো কি?

কোথায় ? গ্রামে-ট্রামে ?

—না, মানিকতলার খুব কাছে। ট্রাম রাস্তা থেকে দু'মিনিটের পথ।

—তুমি ঠাট্টা করছো !

—ঠাট্টা বটে ! পয়লা তারিখে যাবো, জিনিসপত্তর সব গোছগাছ শুরু করে দাও !

—আমরা আগে একবার দেখবো না।

—যেদিন খুশী দেখে আসতে পারো। ঘর এখনো খালি হয়নি, তিরিশ তারিখে খালি হবে।

প্রিয়নাথ স্নান করতে ঢুকে গেলেন। বাকি আলোচনা খেতে বসে হবে।

ছাদের সিঁড়ির পাশের ছোট ঘরটিতে টোটো আর জাপানী চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়া মুখস্থ করছিল। টোটোর পড়া চলতেই লাগলো, জাপানী এবার বই মুড়ে রেখে উঠে এলো। সামনেই টোটোর হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা, আর জাপানী পার্ট টু দেবে।

মা বাবার শোবার ঘরে মেঝেতে একটু জল ছিটিয়ে জাপানী একটা আসন পেতে দিল। পাশে রাখলো কাঁসার গেলাসে জল, নুনের বাটি আর একটা প্লেটে কয়েকটি কাঁচা লঙ্কা। প্রিয়নাথ এক সময় দারুণ ঝাল খেতে পারতেন, ঝাল ছাড়া কোনো রান্নাই মুখে রুচতো না, এদিকে কল্যাণী আবার ঝাল সহ্য করতে পারেন না একেবারে, ছেলেমেয়েরাও মায়ের রুচি পেয়েছে। সেই জন্যই প্রিয়নাথের জন্য আলাদা কাঁচা লঙ্কার ব্যবস্থা। আজকাল তিনিও আর বিশেষ ঝাল খান না, তবু চোখের সামনে কাঁচা লঙ্কা থাকা চাই।

—মা, সত্যিই আমরা এ বাড়ি ছেড়ে যাবো ?

কল্যাণী মেয়ের হাতে ভাতের থালা তুলে দিয়ে বললেন, তোর বাবা তো তাই বলছে !

ভাতের থালা হাতে নিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল জাপানী। প্রিয়নাথ চুল আঁচড়ে আসনে বসবার পর সে থালাটা সামনে রাখলো।

পাঁচটি ভাত থালার ডানপাশে রেখে গণ্ডুষে একটু জল নিয়ে প্রিয়নাথ উৎসর্গ করলেন প্রথমে। তারপর থালার ওপর পরিপাটি করে সাজানো ভাতের মাঝখানে খোঁদল করে বাটির সবটা ডাল ঢেলে দিলেন তার মধ্যে। এবার একটু একটু করে মেখে খাবেন। প্রিয়নাথের খাওয়া একটা দেখার মত দৃশ্য। ডাঁটা পর্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে চিবিয়ে শেষ করেন, খাওয়ার পর পাতে কিছুই পড়ে থাকে না। কাঁসার থালাখানা নতুনের মতন ঝকঝক করে, মনে হয় যেন না মাজলেও চলে।

মায়ের কাছ থেকে বেগুনভাজা আনতে গিয়ে জাপানী আবার বললো, আমার বন্ধুরা সবাই বলছে, এ বাড়ি ছাড়ার কোনো মানেই হয় না। এত ভালো বাড়ি, ওরা হাজার চেষ্টা করলেও আমাদের তুলতে পারবে না!

—সে কথা তোর বাবাকে বল না!

জাপানী ঘরে এসে বললো, বাবা, আপনাকে আর একটু ডাল দেবো?

—দে। ছ্যাখ তো এক টুকরো লেবু পাস কি না।

প্রিয়নাথের বয়েস প্রায় আটান্ন। মাথার চুল বেশী পাকেনি বলে বয়েসটা ঠিক বোঝা যায় না। বেশ লম্বা, সুগোল ধরনের চেহারা, তবে নাকটি খুব খাড়া। রং ফর্সা ছিল এক সময়, গত কয়েক বছর ধরে মুখে একটা ক্লান্তির ছাপ পড়ে গেছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে গাম্ভীর্য।

দু'খানা মাছভাজা নিয়ে কল্যাণী নিজে এলেন রান্নাঘর ছেড়ে। মাছ দেখেই ভুরু উঁচু করলেন প্রিয়নাথ। আজ একুশ তারিখ। মাসের শেষে এই সময়টায় শুধু রবিবার মাছ আসে। প্রিয়নাথ নিজে বাজার করেন না, কিন্তু কোন্‌দিন কী আসবে বাজার থেকে, তা বলে দেন আগে থেকে।

—মাছ? ইলিশ মাছ?

—খোকন পাঠিয়েছে।

—খোকন এসেছিল এ বাড়িতে?

—খোকন আসেনি, ওদের রান্না করে যে ছেলেটা, শিবু, সে এসে দিয়ে গেল।

—তোমরা খেও, আমি খাবো না।

—কেন, খাবে না কেন? এ বছর তো ইলিশ উঠলোই না ভালো করে। একদিনও খাওনি।

ইলিশের দাম কত জানো? চব্বিশ টাকা কিলো, মাসের শেষে চোর ছাড়া কেউ ইলিশ মাছ খেতে পারে না কলকাতায়।

—তোমার যতসব অদ্ভুত কথা।

—খোকনের বেশী টাকা হতে পারে।

—খোকন কেনেনি! বৌমা চিঠি লিখেছে, ওর বাপের বাড়ি থেকে একটা বেশ বড় ইলিশ পাঠিয়েছে সকালে।

—বৌমার বাপের বাড়ির পুকুরে কি ইলিশ মাছও হয় নাকি?

—সবটা শোনো আগে—বৌমার বাবাকে একজন একজোড়া ইলিশ দিয়ে গেছে, তার থেকেই একটা।

—বৌমার বাবাকে কে ইলিশ দিয়েছে?

—সে আমি কী জানি!

—এমনি এমনি কেউ জোড়া ইলিশ উপহার দেয় না আজকাল। ওসব ঘুষের মাছ। তোমরা খাও!

—তুমি খাবে না! বৌমা অনেক করে লিখেছে।

—না!

কল্যাণী দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্লেটটা নামিয়ে রাখলেন পাশে। একবার না বললে আর হ্যাঁ করানো যাবে না। অথচ মানুষটা মাছ খেতে খুবই ভালোবাসে। বিশেষত ইলিশ মাছ।

—এত কম টাকায় কে বাড়ি ভাড়া দিচ্ছে আমাদের?

—আমার এক ছাত্র খোঁজ দিল।

—থাকা যাবে সে বাড়িতে?

—কেন যাবে না? সে বাড়ি কি খালি পড়ে আছে? এখনো লোক আছে সেখানে, বললাম না?

—তবু, এরকম ভালো বাড়ি ছেড়ে।

—এটা কি তোমার নিজের বাড়ি? ভাড়া বাড়ি কখনো না কখনো ছাড়তেই হয়। অন্যায়ভাবে আমি এখানে থাকতে রাজি নই।

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে জাপানী। কালো আর হলুদ রঙের ফুল ছাপা একটা শাড়ি পরে আছে, দুটি রংই বেশ চড়া ভাবে মেলানো। চুলের বেণী খুলতে খুলতে কথা শুনছে, সে মায়ের দলে হলেও মায়ের পক্ষ নিয়ে কোনো কথা বলতে পারে না বাবাকে।

প্রিয়নাথ মুখ তুলে মেয়েকে বললেন, টোটোকে চ্যাচাতে বারণ কর। ওকে একবার ডাক এখানে।

টোটো তার ঘরের জানালা দিয়ে এই ঘরটা দেখতে পায়। পড়া মুখস্থ করতে করতেও সে এদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখে। বাবা বেরিয়ে যাবার পরই তার নানা রকম ক্রিয়াকলাপ শুরু হবে।

—আমায় ডাকছেন?

এ বাড়ির সকল ছেলে মেয়েরাই বাবাকে আপনি সম্বোধন করে। মাকে তুমি। কল্যাণী ক্রমশই বিস্মিত হচ্ছেন। আজ সকালের সমস্ত রুটিনই যেন বদলে গেছে। অন্য কোনোদিনই প্রিয়নাথ ছোট ছেলের সঙ্গে কথা বলার সময় পান না। টোটোর সঙ্গে তার বাবার যাবতীয় বোঝাপড়া হয় রবিবার কিংবা অন্য ছুটির দিনে। সেসব দিন প্রিয়নাথ ছেলেকে নিজে পড়াতে বসেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাড়িতে দক্ষযজ্ঞ বেধে যায়।

—শোন টোটো, ওরকম চিৎকার করে পাড়া মাথায় তোলবার কোনো দরকার নেই। পড়তে হয় মনে মনে পড়বি। আর যদি পড়তে না চাস, পড়িস না। পরীক্ষা দিতে না চাস, তাও না দিতে পারিস। আমি তোর পড়াশুনো নিয়ে আর জোর করব না।

টোটো আড়ষ্ট হয়ে গেল। বাবা হঠাৎ কেন বকুনি দিতে শুরু করলেন সে ধরতে পারলো না ঠিক। বকুনির কায়দাটা আলাদা।

কল্যাণী বললেন, পরীক্ষা দেবে না কেন? এ আবার কী কথা? তুমি ওকে বারণ করেছো?

—বারণ করবো কেন? আমার যা বলার বললাম, ওর যা ইচ্ছে তাই করবে। পরীক্ষা দিতে চায় না, পাস করতে চায় না ফেল করতে, সেসব ও নিজে বুঝবে।

—আজকাল তো মন দিয়েই পড়ে।

—ভালো কথা। অত চ্যাঁচাবার দরকার নেই। এখন যা।

টোটো এ ঘর থেকে নিজের ঘরে যেতে যেতে একবার নাক কুঁচকোলো। বকুনি-টকুনি আর সে গ্রাহ্য করে না, গায়ে লেগে পিছলে বেরিয়ে যায়।

—তুমি সত্যিই মাছ খাবে না? বৌমা এত করে পাঠিয়েছে।

—তোমরা খেও!

খাওয়া শেষ হয়ে গেছে, প্রিয়নাথ এবার জলের গেলাসটা তুলে নিলেন হাতে

—স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের পাশ দিয়ে যে ছেলেটার সঙ্গে যাচ্ছিলি, সে ছেলেটা কে?

জাপানী একেবারে সাঙ্ঘাতিক চমকে উঠলো। হঠাৎ যে তার প্রতি এইদিক থেকে আক্রমণ আসবে, সে কল্পনাও করতে পারেনি। রাস্তায় কোনো আলো ছিল না, লোড শেডিং, তাও বাবা দেখে ফেলেছেন?

উঃ, আর পারা যায় না।

—ছেলেটি কে?

প্রিয়নাথের গলায় ঝাঁঝ নেই। খুব সাধারণ নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে যেন তিনি একটা খবর জানতে চাইছেন। অর্থাৎ লক্ষণ খুবই খারাপ, হঠাৎ এক সময় ফেটে পড়বেন।

কল্যাণীও সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়েছেন জাপানীর দিকে। মেয়ে তাকে সব কথা বলে। কিন্তু এ খবরটা দেয়নি তো। ক্লাসের ছেলেদের সঙ্গে যাতে আড্ডা দিয়ে না বেড়ায়, সেইজন্যেই ওকে ভর্তি করা হয়েছিল সকালবেলায় সিটি কলেজে। জাপানী প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হবার জন্য কান্নাকাটি করেছিল। ওর স্কুলের দু'জন বান্ধবী ভর্তি

হয়েছে প্রেসিডেন্সিতে।

—আমাদের একজন মাস্টারমশাই। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।

—তারপর ?

জাপানী চুপ করে গেল।

প্রিয়নাথ বললেন, তারপর দু'জনে একসঙ্গে একটা রিক্‌শায় উঠলি একটু;একটু বৃষ্টি পড়ছিল···আধুনিক ছেলেরা রিক্‌শায় চাপে!

কল্যাণীর বুকে যেন বজ্রপাত হয়েছে। তিনি বিমূঢ়ভাবে একবার মেয়েকে একবার স্বামীকে দেখতে লাগলেন।

ধীরে সুস্থে জলটা শেষ করে গেলাসটা নামিয়ে রাখলেন প্রিয়নাথ। পরিষ্কার থালায় একটা আঙুল ঠেকিয়ে সেই আঙুলটা আবার জিভে ছুঁইয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করলেন মনে মনে। তারপর থালাটা একটু ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মুখ তুলে সোজাসুজি তাকালেন জাপানীর দিকে।

—ছেলেটির কী জাত, আমি জানতে চাই না। সে যদি বিয়ে করতে চায়, তোর মাকে বলিস, আমি ব্যবস্থা করে দেবো। অসবর্ণ বিয়েতে আর আমার আপত্তি নেই।

জাপানী এবার কেঁদে ফেললো। মাটিতে বসে পড়ে আলুথালু গলায় বললো, না, বাবা, সত্যি বলছি সেসব কিছু নয়, বৃষ্টি পড়েছিল, উনি বললেন···

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে প্রিয়নাথ বললেন, রিক্‌শায় চেপেছিস, বেশ করেছিস! আমি কি আপত্তি করেছি? আমার কথাটা মন দিয়ে শোন! সে যদি তোকে বিয়ে করতে চায়, কিংবা অন্য কোনো ছেলেকে যদি তুই বিয়ে করতে চাস, তবে তার সঙ্গেই বিয়ে দেবো। কুষ্টি দেখতে চাইবো না, জাতের কথা তুলবো না, বংশ দেখবো না, তোদের যা খুশি তাই করবি।

জাপানী দৌড়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

প্রিয়নাথ পরিতৃপ্তির ঢেকুর তুললেন একটা। কল্যাণী অসহায়, বিভ্রান্ত, ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার আজ কী হয়েছে বলো তো!

—কিছু হয়নি তো!

বলেই প্রিয়নাথ আবার হাসলেন। সেই সাঙ্ঘাতিক ভয় দেখানো হাসি। অন্তত পাঁচ সাত বছরে মধ্যে কেউ সকালবেলা এই সময় প্রিয়নাথকে হাসতে দেখেনি।

॥ ২ ॥

সাধারণত অফিসের ক্যান্টিন থেকে খাবার আনিয়েই লাঞ্চটা সেরে নেয় দেবকুমার। কিন্তু আজ দুপুরে সে বাড়িতে খেতে এসেছে।

দুখানা ঘরের খুব ছোট ফ্ল্যাট। সেটাই বেশ সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে অনুরাধা। একটি ঘরে একদিকে খাবার টেবিল, অন্য দিকে বসবার জায়গা। অন্যটি শোবার ঘর, দুটি বড় বালিশের মাঝখানে একটা ছোট্ট বালিশ, সেটা বুনবুনের। তার বয়েস চার, এরই মধ্যে সে স্কুলে যায়। সাড়ে আটটার সময় অফিস যাবার পথে দেবকুমার বুনবুনকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে যায়, সাড়ে বারোটার সময় অনুরাধা নিয়ে আসে।

রান্নাঘরটা এতই ছোট যে একজনের বেশী দু'জনের দাঁড়াবার জায়গা নেই। অনুরাধার যদি কোনো দিন কিছু একটা রাঁধবার ইচ্ছে হয়, তখন সে শিবুকে বাইরে বসিয়ে রাখে। বাথরুমটি মোটামুটি ভালো হলেও, একটা খুব অসুবিধে জামাকাপড় শুকোতে দেবার জায়গা নেই। ফ্ল্যাটটি দোতলার, সামনে একটি নামমাত্র বারান্দা। বাড়ির সামনের দিকের বারান্দায় জামা কাপড় শুকোতে দেয়া অত্যন্ত গেঁয়ো গেঁয়ো ব্যাপার বলে অনুরাধা তাতে কিছুতেই রাজি নয়। নিজের বারান্দায় সে ফুলের টব রেখেছে। ফলে দুপুরবেলা ঘরের মধ্যেই দড়িতে সায়া শাড়ি শার্ট ঝোলে। বাইরের লোকেরা অবশ্য এসব অসুবিধা বুঝতে পারে না। সন্ধ্যেবেলা কেউ বেড়াতে এলে বলে, বাঃ, বেশ ছিমছাম সুন্দর ছোট্ট ফ্ল্যাটটি তো। দেবকুমারের অফিসের

বন্ধুরা প্রায়ই আসে।

জুতো খুললো না, বাথরুমে হাত মুখ ধুয়ে এসেই দেবকুমার খেতে বসে গেল। এক ঘণ্টার মধ্যে তাকে অফিসে ফিরে যেতে হবে।

বুনবুনের তখনও খাওয়া শেষ হয়নি। সে এখনও নিজে খেতে শেখেনি, কিন্তু খাওয়া কী করে ফাঁকি দিতে হয় তা শিখেছে খুব ভালোভাবে। দুখানা ঘরে সে লুকোচুরি করে বেড়াচ্ছে আর অনুরাধা খাবার হাতে নিয়ে ছুটছে তার পেছনে। এক সময় অনুরাধা ধৈর্য হারিয়ে ফেললো। ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলো, পারি না! কী অসভ্য মেয়ে। বাপি বসে আছে, তাকে খেতে দেবো—

এই মৃদু বকুনি গ্রাহ্য না করে হেসে উঠলো বুনবুন, মায়ের হাতে একটা ধাক্কা দিতেই পড়ে গেল সব খাবারটা। অনুরাধা ঠাস করে এক চড় কষালো মেয়েকে—।

বুনবুনের কান্না থামাবার জন্য তক্ষুনি উঠে এসে তাকে কোলে তুলে নিল দেবকুমার। অনুরাধার দিকে ভুরু কুঁচকে বললো, জানো আমি মারটার একদম পছন্দ করি না—।

বুনবুনের এমনই জেদী স্বভাব যে মা বকুনি দিলে বা মারলে তখন বাবা যতই আদর করুক, তাতে সে কিছুতেই শান্ত হবে না। মাকেই আদর করতে হবে। সুতরাং একটু বাদেই দেবকুমারের কোল থেকে নামিয়ে দিতে হল বুনবুনকে, অনুরাধা তার মুখ মুছিয়ে নিয়ে গেল শোওয়ার ঘরে। মিনিট দশেক ধরে চললো শান্তিপর্ব, ততক্ষণ চেয়ারে বসে পা দোলাতে লাগলো দেবকুমার। বেশী চিৎকার করে কাঁদলে বুনবুন অবশ্য তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে।

নিজের সন্তান হবার পর দেবকুমার বুঝতে পেরেছে যে, 'খোকা ঘুমোল পাড়া জুড়োলো'—এই ছড়াটি যিনি রচনা করেছেন, তিনি একজন সত্যদ্রষ্টা মহাকবি।

বুনবুনকে অনুরাধা মারলে সেই মার যেন দেবকুমারের নিজের গায়ে লাগে। যতই দুরন্ত হোক, এটুকু মেয়ে তো! আবার এক এক-

সময় দেবকুমার নিজেও বকুনি দিয়ে ফেলে, তাতে আবার রেগে যায় অনুরাধা। তখন সে বলে, মেয়েকে তো শুধু বকতেই পারো কখনো তো কাছে নিয়ে বসতে দেখি না। মেয়ে বাবাকে পায় কতটুকু ?

বনবুনের মুখখানা খুব মিষ্টি, দেখলে চট করে বোঝাই যায় না যে সে এত দুষ্টু। এক সঙ্গে দশজন লোককে সে নাজেহাল করে দিতে পারে। কেউ যদি এসে বলে, বাঃ কী সুন্দর দেখতে মেয়েটিকে, ঠিক পুতুলের মতন! অমনি কেঁদে উঠবে বুনবুন। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে সে 'পুতুলের মতন' কথাটা এতবার শুনেছে যে এখন শুনলেই রেগে যায়।

বাচ্চারা তো দুষ্টু হবেই, দেখতেও ভালো লাগে। কিন্তু অপরের বাড়িতে গিয়ে যখন বুনবুন দুষ্টুমি করে কোনো জিনিসপত্র ভেঙে দেয়, তখন বড় লজ্জায় পড়ে যায় দেবকুমার। অনুরাধা তখন বুনবুনকে একটুও বকে না। মায়েরা এরকমই অন্ধ হয়। গত রবিবার রতীশদের বাড়িতে গিয়ে রতীশের ছেলেকে খিমচে রক্ত বার করে দিয়েছিল বুনবুন, তখন তো অনুরাধার উচিত ছিল ওদের সামনেই বুনবুনকে কিছু শাস্তি দেওয়া অন্তত কড়াভাবে একটা ধমক! অনুরাধা সে রকম কিছুই না করে, উল্টে রতীশের ছেলে মণ্টুকে বললো, তুই অন্য ঘরে গিয়ে খেল গে মণ্টু! ইস্ ছি ছি! রতীশের স্ত্রী তখন কী রকম ভাবে তাকিয়ে ছিল অনুরাধার দিকে। অনুরাধার এমনিতে এতবুদ্ধি, অথচ এই সব ব্যাপারে যেন অন্ধের মতন।

অনুবাধা বুনবুনকে ঘুম পাড়িয়ে খাবার টেবিলে এসে বসে বললো, তুমি আরম্ভ করে দাওনি কেন ?

দেবকুমারের অধৈর্য মুখখানিতে এই কথাটি অনুক্ত রইলো, সে কথা আগে বলতে পারতে।

খাবার টেবিলের রং হলুদ। সেই কারণে জানলার পর্দাগুলোও হলদে। খাবার প্লেট থেকে অন্যান্য বাসনপত্র সবই চীনেমাটির, অনুরাধা স্টেইনলেস স্টিল পছন্দ করে না। স্টেইনলেস স্টিলের জিনিস নাকি, অনুরাধার মতে, নিষ্প্রাণ।

প্রথমে ভাত, ডাল, মাছ ভাজা ও মাছের ডিম ভাজা। অনুরাধা বললো, আজ কিন্তু তরকারি-টরকারি কিছু করিনি। শুধু মাছ।

দেবকুমার বললো, ঠিক আছে।

—ফ্রিজটা কবে দেবে? খোঁজ নিয়েছিলে?

—পরশু তো দেবার কথা। এই সঙ্গে রং করে দিতেও বলেছি।

ফ্রিজটা চলতে চলতে হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল একদিন। মিস্ত্রি এসে দেখে বলেছিল, চেম্বার খারাপ হয়ে গেছে।

তার মানে বহু টাকার ধাক্কা। অথচ উপায়ও নেই। কিন্তু পরে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, ব্যাধিটা অত গুরুতর নয়, দু' তিনশ টাকায় হয়ে যাবে।

নতুন সংসার পেতে প্রথমেই ফ্রিজটা কিনেছিল দেবকুমার! তখন হাতে টাকা ছিল না বেশী। বাড়িওয়ালাকে এক বছরের ভাড়া অ্যাডভান্স দিতে হয়েছিল, তাই পার্ক স্ট্রীটের নিলাম-ঘর থেকে সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ফ্রিজটা কিনেছিল। অনুরাধা ফ্রিজ-ওয়ালা পরিবার থেকে এসেছে, ফ্রিজ ছাড়া সংসার চালানো তার পক্ষে অকল্পনীয়।

ডাল পর্ব শেষ হবার পর মাছের ঝোল ঢালতে গিয়ে অনুরাধা বললো, এই যাঃ।

—কী?

—মাছের তেল রাখা ছিল! তুমি তো মাছের তেল ভালোবাসো। এখন খাবে?

—থাক, শিবুকে দিয়ে দিও।

বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে অনুরাধা দেখেছিল, ইলিশ মাছ ভাজার সময় যে তেলটা বেরোয়, ও বাড়ির লোকেরা সেই তেল ভাতের সঙ্গে মেখে খায়। অনুরাধা নিজের বাড়িতে এসব কখনো দেখেনি। এরকম তেল খাওয়ার ব্যাপারটা সে জানতোই না। ঐ জন্যই আজ তেলটা রেখে দিয়েও ঠিক সময় দেবার কথা মনে পড়েনি।

—আরও মাছ নাও। এই তো এখনো অনেক রয়েছে।

—নিচ্ছি। তুমি নেবে না?

—আমি বাবা বেশী মাছ খেতে পারি না। তুমি ভালোবাসো, তুমি বেশী করে নাও। শেষ করতে হবে, ফ্রিজ নেই, রেখে দেওয়া তো যাবে না।

—বাবাকে মাছ দিয়ে এসেছিলে ?

—হ্যাঁ।

—দেখা হলো বাবার সঙ্গে। কিছু বললেন ?

—আমি যাই নি, শিবু দিয়ে এসেছে।

—তোমার নিজের যাওয়া উচিত ছিল।

—ভেবেছিলাম তো যাবো। সেই সময় শর্মিলা এসে গেল। সেইজন্যই শিবুকে পাঠাতে হলো, আমি অবশ্য একটা চিঠি লিখে দিয়েছি।

—রান্না কে করেছে, তুমি না শিবু ?

—শিবু। কেন ? ভালো হয়নি বুঝি ?

—অসম্ভব ঝাল। উরেঃ বাবা, জিভ জ্বলে যাচ্ছে।

অনুরাধা শুধু দুখানা ভাজা মাছ খেয়েছে। ঝোল চেখেও দেখেনি। ওরা দু'জনে কেউই ঝাল খেতে পারে না। শিবু কেন তবু এত ঝাল দিয়েছে! নিশ্চয়ই নিজে আরাম করে খাবে বলে।

তখন শিবুকে ডেকে একটু ধমকানো হলো। ইতিমধ্যে পাশের ঘর থেকে বুনবুন একবার কেঁদে উঠতেই অনুরাধা শিবুকে বললো, শিগগির যা, ওকে একটু চাপড়ে দে।

দেবকুমার খাওয়া বন্ধ করে হাত গুটিয়ে নিয়েছে।

—ও কি ? আর খাবে না ?

—না।

আর একটা বাটির ঢাকনা খুলে অনুরাধা বললো, এই ছাখো এখনও কত মাছ রয়েছে।

দেবকুমার চমকে উঠে বললো, মুড়ো ? মুড়োটা তুমি বাবাকে পাঠাওনি ?

অনুরাধা একটু অপরাধী হয়ে গিয়ে বললো, না তো।

দেবকুমার খানিকটা ধমক দিয়ে বললো, বাবা মুড়ো খেতে ভালো-বাসেন, তুমি জানো না? এই মুড়ো এখন কে খাবে? আমি ইলিশ মাছের মুড়ো কোনোদিন খেয়েছি? দেখেছো তুমি?

অনুরাধা বুঝতে পেরেছে নিজের ভুল। মাগুর মাছ আর পোনা মাছ ছাড়া আর কোনো মাছের মুড়োই খায় না দেবকুমার। সে ঠিক কাঁটা বাছতে পারে না। অনুরাধা তো পারেই না। তার শ্বশুর আর দেওরকেই দেখেছে, পরিপাটি করে সব রকম মুড়ো চিবিয়ে খেতে। এমন কি অনেক সময় ওরা বাজার থেকে মাছ আনে না, শুধু মুড়ো কিনে আনে। আস্ত গলদা চিংড়ি না কিনে শুধু মাথাগুলো নিয়ে আসে ভাজা খাবার জন্য। অনুরাধা আগে এসব কক্ষনো দেখেনি।

—তা ছাড়া এত মাছ রেখেছো কেন? আরো বেশী করে পাঠিয়ে দিতে পারোনি ও বাড়িতে?

—তুমি তো বলে গেলে কিন্তু মাছ পাঠিয়ে দিতে—

—কিছু মানে কতটা, সেটা তোমার নিজের বোঝা উচিত ছিলো। জানো, ফ্রিজ নেই।

—আমি অদ্ধেকটা পাঠিয়ে দিতে বললাম শিবুকে। তুমি কত খাবে না খাবে, তা তো বুঝতে পারি নি।

—আমি তো রাক্ষস নই। এখন এত মাছ কে খাবে? এই গরমের দিনে এ বেলার মাছ ওবেলাও খাওয়া যায় না। দাও, সব শিবুকে দিয়ে দাও।

—এত মাছ খেলে শিবুর পেট খারাপ হবে। এক কাজ করবো, সুনীলদাদের কিছু পাঠিয়ে দেবো?

—দিলে আগেই দেওয়া উচিত ছিল। এত বেলায় কেউ মাছ পাঠায়?

—সুনীলদারা অনেক দেরি করে খায়। এখনো সুনীলদার স্নানই হয়নি। তাই পাঠিয়ে দিই বরং—এই শিবু!

উক্ত সুনীলদারা দেবকুমারের প্রতিবেশী। এত কাছাকাছি বাড়ি যে এ বাড়ি ও বাড়ির অনেক কথাবার্তাও শোনা যায়। ও বাড়ির

বাথরুমটা এ বাড়ির রান্নাঘরের কাছেই। দুপুরবেলা বাথরুমে হেঁড়ে গলায় গান শোনা গেলে বোঝা যায়, সুনীলদা এবার স্নান করতে ঢুক-লেন। এক একদিন দুটো আড়াইটে বেজে যায়।

হাত ধুয়ে এসে দেবকুমার শোবার ঘরের ড্রেসিং টেবিলের আয়-নার সামনে দাঁড়িয়ে টাইটা একটু ঠিক করে নিল। তারপর ঘুমন্ত বুনবুনের গালটা টিপে দিল একবার। এবার মেয়েটা সত্যিই ঘুমি-য়েছে।

অনুরাধা মসলার কৌটো থেকে খানিকটা মসলা মুখে দিল। দেব-কুমার মসলা খায় না। এখন সে একটা সিগারেট মৌজ করে টেনেই অফিসের দিকে দৌড়োবে।

অনুরাধা খুব মিষ্টি করে জিজ্ঞেস করলো, আজ কখন ফিরবে?

খাবার টেবিলে দেবকুমার অনুরাধার ওপর মেজাজ দেখিয়েছে, এবার অনুরাধার শোধ নেবার পালা।

—দেবকুমার চিন্তিত ভাব করে বললো, একটু দেরি হবে।

—ক'টা।

—ঠিক বলতে পারছি না, এই আটটা ন'টা হতে পারে।

—অতক্ষণ অফিসে থাকবে?

—না, অফিসে না····আমাদের সাউথ জোনের ম্যানেজার আয়েঙ্গার এসেছে, আয়েঙ্গারকে তো তুমি চেন? সেবার বাঙ্গালোরে দেখা হলো।

—হ্যাঁ চিনি।

—ও উঠেছে গ্র্যাণ্ড হোটেলে···আমাদের দু'তিনজনকে ডেকেছে সন্ধ্যের পর, বোধহয় ডিনার না খাইয়ে ছাড়বে না।

—তার মানে এগারোটা হবে।

—না, না অতক্ষণ না।

—সারা সন্ধেটা আমি কী করবো? শর্মিলাকে আমি বললাম, আজ ওর সঙ্গে মিলিমাসীদের বাড়ি যাবো।

—যাও না ঘুরে এসো।

—বাঃ, অমনি মুখের কথা বলে দিলে। বুনবুনকে কোথায় রেখে যাবো? মেয়েকে ফেলে আমার কোথাও যাবার উপায় আছে?

—ওকে সঙ্গে নিয়ে যাও!

—মিলিমাসীদের বাড়িতে অতগুলো কুকুর···লাস্ট যেদিন গেলাম একটা তো বুনবুনকে প্রায় কামড়েই দিচ্ছিল···এ্রটুকু মেয়ে, ওকে কি সবসময় সামলে রাখা যায়?

—তা হলে মিলিমাসীদের বাড়িতে যেও না!

—মিলিমাসীদের বাড়িতে আজ গান বাজনা আছে। ছবি ব্যানার্জি গাইবেন। মিলিমাসী অনেক করে যেতে বলেছিলেন।

—ও!

—ও মানে?

—তুমি কী বলতে চাইছো? আমি সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে বুন-বুনকে পাহারা দেবো, আর তুমি মিলিমাসীদের বাড়িতে গান শুনতে যাবে?

দেবকুমার ফাঁদে পা দিয়েছে। সে রেগে যাচ্ছে। অনুরাধার কিন্তু এখনো পর্যন্ত গলায় কোনো রকম উত্তেজনা নেই, মুখখানা হাসি হাসি।

—তুমি রাত এগারোটা পর্যন্ত বাইরে কাটাবে আর আমি দিনের পর দিন ঠায় বাড়িতে বসে থাকবো? আমার কাজ শুধু মেয়েকে সামলানো? মেয়ে আমার একলার?

—তুমি এমনভাবে বলছো যেন রাত এগারোটা পর্যন্ত আমি বাইরে ফূর্তি করে বেড়াই। গ্র্যাণ্ড হোটেলে যাবো বটে, কিন্তু সেটাও অফিসের কাজ। আয়েঙ্গার আমাদের সঙ্গে আড্ডা দেবার জন্য কোম্পানীর টাকায় এখানে আসেনি।

—অফিসের কাজ শুধু অফিসে হয় না?

—না হয় না। ডোনট টক লাইক আ কমন হাউসওয়াইফ।

এবার কিছুক্ষণ ইংরেজি চলবে। দেবকুমার ও অনুরাধা দু'জনেই সুশিক্ষিত। ওরা মাগী, খানকি, ছোটলোক ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার

করে না ঝগড়ার সময়। তার বদলে বীচ, ডিকাডেন্ট, আনকালচার্ড হাও দা হেল, সোয়াইন, ইল-ব্রেড এই সব অনর্গল বলে যায়।

জানলা দিয়ে সিগারেটের টুকরো বাইরের রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলা একদম পছন্দ করে না অনুরাধা। দেবকুমার সেটাই করলো।

অনুরাধা বললো, আমি দিনের পর দিন বাড়িতে বসে থাকি, তুমি আমাকে একদিনও বাইরে নিয়ে যাবার কথা ভাবো? কোনোদিন নিয়ে গেছ।

—কোনোদিন নিয়ে যাইনি?

—কবে গেছে, বলো?

কিছু একটা বেশি কঠিন কথা বলতে গিয়ে থেমে গেল দেবকুমার। ক্রুদ্ধ বাঘের মতন ফোঁস করে নিশ্বাস ফেললো। সমস্ত স্ত্রী জাতির ওপর সে বিদ্বিষ্ট হয়ে গেছে এই মুহূর্তে। এরা এত অকৃতজ্ঞ হয়!

এই জন্যই বলেছিলাম ও বাড়ি ছেড়োনা। একসঙ্গে থাকার অনেক সুবিধে। আগে আমার মায়ের কাছে বুনবুনকে রেখে তুমি যখন তখন বেরিয়ে যেতে।

আস্তে, অত জোরে চেঁচিয়ো না! বুনবুন জেগে যাবে!

—আমি অফিসে চললাম।

—শোনো।

—ও বাড়িতে থাকতে তুমি যথেষ্ট স্বাধীনতা পেতে। তবু তোমার সহ্য হল না। বাড়ি ছাড়বার জন্য আমাকে পাগল করে তুলেছিলে।

—ফিলথি লায়ার! আমার জন্য তুমি বাড়ি ছেড়েছো? না নিজের জন্য! মদ খেয়ে বাড়ি ফিরে তোমার বাবার সামনে পড়ে লজ্জা পেয়ে, সেইজন্যও ছাড়নি?

—কক্ষনো না। বাবা আমাকে কোনোদিন কিছু বলেন নি।

—তুমি আস্তে কথা বলতে পারো না? নর্থ ক্যালকাটার লোকেদের মতন চিৎকার না করে বুঝি কথা বলতে পারো না? অসভ্যের মতন সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে—

—সাউথ ক্যালকাটার সবাই সভ্য, তাই না? তোমার বাবা

যখন চাকরকে ধমকান, ওফ, মনে হয় যেন যুদ্ধ লেগে গেছে। চাকর-বাকরদের মানুষ বলেই মনে করেন না।

—এই, আমার সম্পর্কে কিছু বলবে না—

—আমি অফিসে চললাম। তোমার সঙ্গে কথা বলে শুধু শুধু সময় নষ্ট করা।

—জানি, আমার সঙ্গে কথা বললেই তোমার সময় নষ্ট হয়, সেই-জন্য সারাদিনে কথা বলার সময়ই পাও না।

—চাকরিটা কি ছেড়ে দেবো বলতে চাও? এদিকে প্রত্যেক মাসে টানাটানি···খালি উপহার আর উপহার! একে দেওয়া তাকে দেওয়া—

—দিদির ছেলেকে একটা টেনিস র‍্যাকেট কিনে দিয়েছি বলে তোমার এত রাগ।

—মোটেই না। আমাকে এখন যেতেই হবে।

—শোনো!

—কী?

অনুরাধার দু'চোখে পরিষ্কার ঝড়ের পূর্বাভাস। এবার তার গলা চড়াবার পালা।

—তুমি আমাকে টেকন ফর গ্রান্টেড ধরে নিয়েছো, তাই নয়? আমি শুধু সংসার সামলাবো আর মেয়েকে দেখবো? আমার আর অন্য রকম কোনো জীবন থাকবে না?

—তোমার যা খুশী তাই করতে পারো!

—একদিন বাড়ি ফিরে দেখবে আমি নেই!

—তাই নাকি?

মসলার শিশিটা মেঝেতে দারুণ জোরে ছুঁড়ে মারলো অনুরাধা। প্রায় ভর্তি মসলা ছিল।

এই নিয়ে তৃতীয়বার মসলার শিশি ভাঙা হলো এক বছরে। প্রত্যেক বারই দেবকুমার ভাবে, কাচের শিশির বদলে অ্যালুমিনি-য়ামের কৌটো ব্যবহার করে না কেন অনুরাধা?

ঝগড়ার পর দ্রুত সঙ্গম সেরে অফিসে পৌঁছতে ঠিক পঁয়তাল্লিশ মিনিট দেরী হলো দেবকুমারের

॥ ৩ ॥

প্রিয়নাথ নামটা কি ঠিক দিয়েছি? আমার আর একটি উপন্যাসে নিশানাথ নামে একটি চরিত্র আছে। প্রিয়নাথ আর নিশানাথ এক ধরনের হয়ে গেল না? বয়স্ক লোকের কথা লিখতে গেলে এখনো নিশানাথ বা বিধুশেখর বা ভবানীপ্রসাদ এই ধরনের ভারী নাম ব্যবহার করি আমরা। দু অক্ষর বা তিন অক্ষরের নাম যেন মানায় না। অথচ তরুণবাবু বলে এক ভদ্রলোককে আমি চিনি, যাঁর বয়স অন্তত পঁয়ষট্টি। তিনিও তো, কারুর বাবা বা ঠাকুর্দা বা দাদু! অথচ বুনবুনের দাদুর নাম তরুণ রাখলে ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য করে তোলাই মুশকিল হতো।

ভদ্রলোকের আসল নাম অখিল। আমরা স্কুলে পড়ার সময় বলতাম অখিল স্যার। আমাদের ইতিহাস আর বাংলা পড়াতেন। বেশ ভালো টিচার, একটু গম্ভীর। কিন্তু রাগী নন। ওঁর ক্লাসে আমরা খুব একটা গোলমাল করতাম না। সেবারে স্কুলে আমরা ছিলাম একটা দুর্দান্ত ব্যাচ। দুজন অঙ্কের স্যারকে স্কুল ছাড়তে বাধ্য করেছিলাম।

অনেক বছর কেটে গেছে। অখিল স্যার নিশ্চয়ই এখন আর আমায় দেখলে চিনতে পারবেন না। প্রতি বছর কত ছাত্র ওঁদের হাত দিয়ে পার হয়ে যায়। আমি এখনো স্কুলের মাস্টারমশাইদের রাস্তায় হঠাৎ দেখলে চিনতে পারি। প্রথম প্রথম ওঁদের কারুকে দেখলেই কাছে গিয়ে টিপ করে প্রণাম করতাম পায়ে হাত দিয়ে। এখন এড়িয়ে যাই। কারুর সঙ্গে চোখাচোখি হলে চট করে মুখটা ফিরিয়ে নিই অন্যদিকে, অন্যমনস্ক হবার ভান করে। যদিও বাল্য-

কালের টুকরো টুকরো দৃশ্য মনে পড়ে যায়, কিন্তু পায়ের ধুলোটুলো নেওয়াটা আর এখন পোষায় না।

সেদিন দেখলাম, সেণ্ট্রাল এভিনিউয়ের কাছে অখিল স্যার হাঁ করে একটি মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। মেয়েটি খুব দারুণ একটা সুন্দরী না হলেও তার শাড়িখানা খুব ঝলমলে রঙের আর সে বেশ স্বাস্থ্যবতী যুবতী। আমার বেশ মজা লাগলো। অখিল স্যারেরও রাস্তায় ঘাটে মেয়ে দেখার বাতিক আছে। অবশ্য এটা কিছু নয়, মাস্টারমশাইরাও তো মানুষ। অখিল স্যার বেশ বুড়ো হয়ে গেছেন, চেহারাটা ভেঙে পড়েছে। এই বুড়ো বয়েসেও অনেকের মন উড়ুউড়ু হয়।

মেয়েটি দাঁড়িয়ে ছিল উল্টো দিকের ফুটপাথে। লাল রঙের পাঞ্জাবি ও চেপা পা-জামা পরা একটি সুশ্রী যুবকের সঙ্গে কথা বলছিল খুব হাত নেড়ে। অখিল স্যার এপাশ থেকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন সেদিকে, যদিও টিপিটিপি বৃষ্টি পড়ছে, তিনি ছাতা খোলেননি, দাঁড়িয়ে ছিলেন ছাতাটায় ভর দিয়ে।

মেয়েটি ও যুবকটি এক সময় একটি রিকশায় উঠে পড়লো। অখিল স্যারের মুখখানি তখন পরাজিত, নিঃস্ব মানুষের মতন আলোশূন্য। তখন আমার মাথায় একটা ঝিলিক দিল।

ঐ মেয়েটির নাম ভুটানী না? অখিল স্যার তা হলে এতক্ষণ নিজের মেয়েকেই দেখছিলেন।

টেস্ট পরীক্ষার পরের দু মাস আমরা স্কুলের কয়েকটি ছেলে অখিল স্যারের বাড়িতে যেতাম সপ্তাহে তিনদিন। উনি একটা কোচিং ক্লাস খুলেছিলেন। সেই জন্যই ওঁর ছেলেমেয়েদেরও আমরা দেখেছি। ওঁর দুই মেয়ের নাম ভুটানী আর জাপানী। মেয়ে দুটি দেখতে খারাপ নয়, রং ফর্সা, শরীরের গড়ন ভালো, শুধু নাক একটু চাপা। বেশ কৌতুকময় মুখ। ভুটানী আমাদেরই বয়েসী, জাপানী তখন খুব ছোট। ভুটানীর দিকে আমরা অলক্ষ্য চোরা চাহনি দিয়েছি অনেকবার। আমরা যে-ঘরে বসে পড়তাম তার সামনে দিয়েই ভুটানী রোজ

বিকেলে শাড়ী আর তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে যেতো। মেয়েদের স্নান-ঘরে ঢোকার সেই দৃশ্য সেই বয়েস থেকে আমাকে উন্মনা করে দেয়।

না. একটা ভুল করেছি। অখিল স্যার রাস্তায় যাকে দেখছিলেন, সে ভুটানী হতে পারে না। ভুটানীকে ঐ রকম বয়েসী চেহারায় আমরা দেখেছি, কিন্তু এতদিনে তার বিয়েটিয়ে হয়ে সে নিশ্চয়ই গিন্নীবান্নী হয়ে গেছে। সেদিনের সেই ছোট্ট জাপানীরই এখন এরকম বড় হয়ে ওঠার কথা! দুই বোনের চেহারায় খুব মিল।

সন্ধেবেলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে দূর থেকে নিজের মেয়ের প্রতি অখিল স্যারের সেই নজর রাখার ভঙ্গিটাই আমার মাথায় একটি কাহিনী এনে দেয়। অখিল স্যারের নামটা বদলে দিলাম. এখন থেকে উনি প্রিয়নাথ। তবে, ওঁর চরিত্র ফোটানোর সময় আমাকে একটা ব্যাপারে সাবধান হতে হবে। আমার বাবাও স্কুল শিক্ষক ছিলেন বলে যে-কোনো শিক্ষকের কথা আমি লিখতে গেলেই আমার বাবার চরিত্রের একটা আদল এসে যায়। কিন্তু অখিল স্যার অর্থাৎ প্রিয়নাথের গল্প সম্পূর্ণ আলাদা।

ওঁর বড়ছেলের নাম দেবনাথ. আমি সামান্য বদলে দেবকুমার করে দিলাম। দেবকুমার নামটা আমার ভারী পছন্দ। দেবকুমার আমাদের চেয়ে অন্তত তিন চার ক্লাস নিচে পড়তো। আগেই বোঝা গিয়েছিল, ও পড়াশুনোয় ব্রিলিয়ান্ট হবে। শ্রুতিধর হিসাবে ওর নাম রটে গিয়েছিল। যে কোনো জিনিস একবার পড়লে ওর মনে থাকে, ক্লাস সেভেনের ছেলে রবীন্দ্রনাথের আফ্রিকা কবিতাটা পুরোপুরি মুখস্থ বলে দেয়। আমার বাবা প্রায়ই আমাকে খোঁটা দিয়ে বলতেন, দেখ তোরও বুদ্ধি আর অখিলবাবুর ছেলে দেবুরও বুদ্ধি। অঙ্ক ইংরেজিতে ওর সমান মাথা। হেড মাস্টারমশাই বলেছিলেন, দেবুকে ডবল প্রমোশন দেওয়া উচিত।

এক স্কুলের শিক্ষকদের ছেলেদের নিয়ে এরকম তুলনা দেবার মনোভাব এসেই যায়। সেই জন্যই আমি তীব্রভাবে ভাবুতুম. ওঃ কবে যে স্কুল ছেড়ে কলেজে যাবো।

সেই সময়ই অনেকে ধারণা করেছিল যে দেবকুমার বড় হয়ে সাজ্ঘাতিক কিছু হবে। দেশবরেণ্য হিসেবে ছড়িয়ে পড়বে তার যশ। স্কুল ফাইনালে দেবকুমার থার্ড হয়েছিল। বি-এতে ইকনমিকস অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, এম-এতেও তাই। প্রত্যেক বছরই বিভিন্ন বিভাগে একজন করে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়, কিন্তু তারা সবাই দেশবরেণ্য হয় না। দেবকুমার একটি কমার্শিয়াল ফার্মে ভালো গ্রেডের অফিসার।

দেবকুমাররা আমার প্রতিবেশী। ওর স্ত্রীর আসল নাম পাপিয়া। শুনলেই একটা বেশ নরম তুলতুলে আদুরে মেয়ের কথা মনে পড়ে, কিন্তু এই মেয়েটি মোটেই সে রকম নয়। যথেষ্ট বুদ্ধিমতী এবং ওর চরিত্রে গভীরতা আছে। এক-একটি মেয়ে থাকে এরকম। যাদের বাইরে থেকে দেখলে কিছু বোঝা যায় না। সেই জন্য আমি ওর নাম বদলে দিলাম। যদিও অনুরাধা নামে আমি আরও দু-একটি মেয়েকে চিনি, কিন্তু কী আর করা যাবে। আমি সাধারণত চেনাশুনো লোক-দের নাম লেখায় এড়িয়ে যাই, কিন্তু মানুষের পরিচয়ের গণ্ডি দিন দিন বাড়ে, অনেক নতুন ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচয় হয়, তাদের নামগুলি সরিয়ে সরিয়ে আমি আমার চরিত্রদের জন্য নামই আর খুঁজে পাই না সহজে। পাপিয়াকে অনুরাধা নামেই মানায়। বাবা মা অনেক সময় ভুল নাম রাখতে পারেন, কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন হয়, কিন্তু সাহিত্য ভুল নাম সহ্য করে না।

ভুটানী এবং জাপানীরও নিশ্চয়ই দুটি ভালো নাম আছে, কিন্তু আমি জানি না। জেনে নিতে হবে, তারপর দেখবো সেগুলোও বদলা-বার দরকার আছে কিনা।

অখিল স্যার অর্থাৎ প্রিয়নাথ মাস্টারমশাইয়ের বাড়িটা আমার বেশ স্পষ্ট মনে আছে। একজন স্কুল শিক্ষকের পক্ষে সত্যিই খুব ভালো বাড়ি। বড় বড় চৌকো কালো সাদা পাথরের মেঝে, তিনখানি প্রশস্ত ঘর, রান্নাঘর, বাথরুম ও নিজস্ব ছাদ। এরকম ফ্ল্যাটের ভাড়া খুব কম করেও এখন ছশো টাকা। আমার বাবা বলতেন, অখিল (প্রিয়নাথ)

খুব দাঁও মেরেছে যুদ্ধের সময়। বলাই বাহুল্য আমরা তখন একটা অন্ধকার ঘুপসি বাড়ির একতলায় থাকতাম।

ব্যাপারটা আসলে এই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অনেকেই বোমার ভয়ে কলকাতা ছেড়ে পালায়। বাড়ি ভাড়া নেমে যায় জলের দরে। প্রিয়নাথের বাড়িওয়ালাও পালিয়েছিলেন, তবে ফাঁকা বাড়ি ফেলে রেখে যেতে সবারই মন খচখচ করে, কেয়ার টেকারও দুর্লভ, সেইজন্যই সেই বাড়িওয়ালা সম্পূর্ণ তিনতলাটা প্রিয়নাথকে ভাড়া দিয়ে যান পঞ্চাশ টাকায়।

বাড়িওয়ালা কথাটা যেন কেমন কেমন শোনায়। বাড়িওয়ালী তো রীতিমত অশ্লীল। এই জন্যই দক্ষিণ কলকাতায় সবাই ল্যাণ্ড লর্ড বা ল্যাণ্ড লেডী বলে। প্রিয়নাথের বাড়িওয়ালা আসলে একজন বিশিষ্ট উকিল ছিলেন। সুখময় চৌধুরী। না, এ নামটা বানাইনি, এটাই ওঁর আসল নাম। সুখময় চৌধুরী খুব কম টাকায় প্রিয়নাথকে ভাড়া দিলেও খানিকটা নীচতা করেছিলেন। আগে ওঁরা নিজেরাই থাকতেন তিনতলায়। কলকাতা ত্যাগের সময় নিজেদের জিনিসপত্র দোতলায়, একতলায় রেখে তিনতলাটা দিয়ে গেলেন প্রিয়নাথকে। অর্থাৎ বোমা পড়লে, প্রিয়নাথের মাথায় পড়ুক।

প্রিয়নাথ তখন যুবক, সদ্য বিয়ে করেছেন. বোমার ভয়ে ভীত হননি। তখন স্কুল কলেজ সব বন্ধ. কিছুদিনের জন্য প্রিয়নাথ কাজ নিয়েছিলেন এ আর পি-তে। আমার বাবা সেই সময় লোহারডগাতে একটা চাকরি নিয়ে চলে যান বলে সেই সময় খুব সস্তায় ভালো বাড়ি নেওয়ার চমৎকার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন।

পঞ্চাশ টাকা বাড়তে বাড়তে ঐ ফ্ল্যাটের ভাড়া এখন হয়েছে একশো পাঁচ টাকা। এই ভাড়া শুনলে অনেকেই এখন বাড়িওয়ালার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে। প্রিয়নাথ ছাড়লেই এক লাফে ছশোয় উঠে যাবে এবং সেই ভাড়াতেই ঐ ফ্ল্যাট নেবার জন্য অনেক লোক মুখিয়ে আছে। সুখময় চৌধুরী মারা গেছেন, তাঁর ছেলেরা কেউ সার্থক হয়নি, ওদের সংসার খুব সচ্ছল নয়। অবশ্য প্রিয়নাথের পক্ষেও

অনেক যুক্তি আছে। সেগুলি আমি যথা সময়ে ওঁর মুখ দিয়েই প্রকাশ করবো।

দীর্ঘ দশ বছর ধরে মামলা চলে। নিয়মিত রেন্ট কণ্ট্রোলে ভাড়া জমা দিয়ে গেলে সেই ভাড়াটেকে তোলা আর টিউব থেকে একবার টুথ পেস্ট বার করার পর সেটাকে আবার টিউবে ভরার মতনই অসাধ্য ব্যাপার। অন্তত আমি এরকমই জানতাম। তবু প্রিয়নাথ সম্প্রতি হেরেছেন। আইনের কোন কুটিল ধারা—উপধারা প্রয়োগে এই কাণ্ডটি সম্ভব হয়েছে তা আমি ঠিক জানি না। হাইকোর্টের মামলায় শেষের দু দিন প্রিয়নাথ খুব অসুস্থ ছিলেন, নিজে যেতে পারেননি টোটোকে বলেছিলেন উকিলের পাশে হাজির থাকতে। কিন্তু টোটো নিজেই তো একটি টোটো কম্পানির ম্যানেজার। তা ছাড়া তখন সে আবার পুলিশের হাঙ্গামায় খানিকটা জড়িয়ে পড়েছিল, তাই সে বিষয়টাকে গুরুত্ব দেয়নি। সেটাই নাকি একতরফা ডিক্রি হওয়ার কারণ, দেবকুমার একদিন কথায় কথায় জানিয়েছিল এবং আরও বলেছিল যে তার বাবার উকিল বাড়িওয়ালা পক্ষের কাছ থেকে মোটা ঘুষ খেয়েছে। টোটোর বদলে দেবকুমার নিজেই যায়নি কেন হাই-কোর্টে ? যাবে কী করে সে তো তখন অফিসের কাজে বাঙ্গালোরে। ছোটভাইটাকে দিয়ে কি বাড়ির কোনো কাজই হবে না ?

দেবকুমারের মতে, মামলায় হেরে গেলেও নাকি প্রিয়নাথের এখনও বাড়ি ছেড়ে যাবার দরকার নেই। চৌত্রিশ বছর ধরে যে ভাড়াটে রয়েছে তাকে এমনভাবে বাড়ি ছাড়া করা যায় না। আবার উল্টে মামলা করা যায় কিন্তু প্রিয়নাথ হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তিনি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন।

অনুরাধা মাঝে মাঝে আসে আমাদের বাড়িতে বই নিতে। বইয়ের নির্বাচন থেকেই ওর রুচি টের পাওয়া যায়। খুব একটা হালকা বই ও পছন্দ করে না। কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে ও এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে মুখের দিকে। কেন অমন করে ঠিক বোঝা যায় না। একটু অস্বস্তিকর লাগে। অবশ্য একটু পরেই ও অকারণে একটা

হাসি দিয়ে সেই অস্বস্তিটুকু কাটিয়ে দেয়।

আজ সকালবেলা আমি একটা কাজে বেরিয়েছিলাম। দশটা-এগারোটার সময় ট্রামে বাসে ওঠা দারুণ শক্ত ব্যাপার। সকালবেলা অফিস যাওয়ার অভ্যেস নেই বলে আমি ভিড়ের ট্রামে বাসে ঠিক ভারসাম্য বজায় রেখে হাতল ধরে পা-দানিতে আঙুল ছুঁইয়ে ঝুলতে পারি না। বড় রাস্তার মোড়ে এসে একটা ট্যাক্সির খোঁজ করছিলাম, এক সময় দূরে একটা খালি ট্যাক্সি দেখা গেল এবং আমি হাত তোলার আগেই একটু দূরে এক মহিলা সেই ট্যাক্সিটা ধরে নিল। সেই মহিলাটি অনুরাধা। আমি মুখ ফিরিয়ে রইলাম।

ট্যাক্সিটা কিন্তু আমার কাছে এসেই থামলো এবং অনুরাধা জিজ্ঞাস করলো, সুনীলদা, আপনি কোথায় যাবেন ? আমি নামিয়ে দিতে পারি।

ট্যাক্সিতে উঠে পড়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কত দূর যাচ্ছো ?

সে কথার সরাসরি উত্তর না দিয়ে অনুরাধা হেসে বললো, আপনি কোথায় যাবেন সেটাই বলুন না।

সুতরাং আমাকে বলতেই হলো যে আমি যাচ্ছি হাওড়া স্টেশনে। অনুরাধা নিশ্চয়ই অত দূরে যাবে না। এসব ক্ষেত্রে আমি নিজে ভাড়া দিতে না পারলে আমার মনটা খচখচ করে। আমি যদিও যাবো পার্ক সার্কাস। কিন্তু হাওড়া স্টেশনের কথা বলাই সুবিধাজনক। অনুরাধা তখন জানালো যে, সে যাবে থিয়েটার রোডে, অর্থাৎ ওকে নামিয়ে দিয়ে যাবার অধিকার আমার আছে।

দু-একটা টুকিটাকি কথা হলো অনুরাধার সঙ্গে। আমি মনে মনে মিটিমিটি হাসছিলাম। অনুরাধা জানে না যে এখন ও আমার উপন্যাসের একটি চরিত্র।

॥ ৪ ॥

চক্রবর্তীদের বাড়ি মঙ্গলা মা এসেছেন।

প্রিয়নাথ স্কুলে বেরিয়ে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই টোটোও বাড়ি থেকে পালায়। পরীক্ষা সামনে, তবু গ্রাহ্য নেই। পড়াশুনোয় ওর কিছুতেই মন বসে না।

জাপানীও বেরিয়েছে কোন এক বন্ধুর কাছ থেকে নোট আনতে হবে। বাবাকে আগে থেকেই বলে রেখেছিল। সুতরাং দুপুরে কল্যাণী একা। নিজে খেয়ে নিলেন, টোটোর ভাত ঢাকা দেওয়া রইলো রান্নাঘরে। কখন সে আসবে ঠিক নেই।

কল্যাণী ছাদে বড়ি শুকোতে দিতে এসেছিলেন. পাশের বাড়ির ছাদ থেকে বিজনের মা বললেন, ও দিদি, আজ আবার মঙ্গলা মা এসেছেন. দেখতে যাবেন নাকি।

মঙ্গলা মার কথা কিছুদিন থেকেই শুনছেন কল্যাণী। উনি থাকেন কাশীতে. মাঝে মাঝে আসেন কলকাতায়। মৃগেন চক্রবর্তীর স্ত্রী নির্মলা কিছুদিন হলো মঙ্গলা মায়ের কাছে মন্ত্র নিয়েছে। মৃগেন চক্রবর্তীর কন্ট্রাকটারির ব্যবসা এবং তিনি পাড়ার দুর্গাপুজো কমিটির স্থায়ী প্রেসিডেন্ট।

দুপুরে তো কোনো কাজ নেই, একবার দেখা করে এলে মন্দ হয় না। মঙ্গলা মা কারুর কাছ থেকে কক্ষনো পয়সা নেন না, এ কথা শুনেই কল্যাণীর খানিকটা ভক্তি জেগেছে। মঙ্গলা মাকে নাকি কেউ প্রণামী হিসেবে কিছু দিতে গেলেও উনি রাগ করে পা দিয়ে ঠেলে দেন।

আটপৌরে শাড়িখানা ছেড়ে কল্যাণী চট করে গরদটা পরে নিলেন। বিয়ের সময়কার শাড়ি জায়গায় জায়গায় একটু পিঁজে গেলেও এখনো মোটামুটি অটুটই আছে। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে

গেলেও কল্যাণী এখনো খুব লাজুক। বাইরে বেরুলে লোকের সঙ্গে কথাই বলতে পারেন না মুখ ফুটে।

ফ্ল্যাটের দরজায় তালা দিতে হবে। টোটো যদি এর মধ্যে ফিরে আসে? কল্যাণী ভাবলেন, ফিরুক, আজ না খেয়ে থাকুক। একটু শান্তি হোক। সেই রকম সংকল্প নিয়েই তিনি তালা লাগালেন এবং সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই মন বদলে গেল, একতলায় নতুন ভাড়াটেরা এসেছে, মাদ্রাজী. সেই মাদ্রাজী বৌকে ডেকে, সে ভালো বাংলা জানে, বললেন, আমার ছেলে এলে এই চাবিটা দিয়ে দিও তো পদ্মিনী।

বিজনের মা বললেন, আমাদের ছাদের টবে কতকগুলো জুঁই ফুল ফুটেছিল। নিয়ে এলাম মঙ্গলা মার জন্য। উনি ফুল পেলে খুশী হন।

কল্যাণী বললেন, আমি যে কিছু নিলাম না।

বিজনের মা এক মুঠো ফুল কল্যাণীর হাতে দিয়ে বললো: এই তো আমাদের দুজনের হলো।

মৃগেন চক্রবর্তী এক সময় যে দোতলা বাড়িটায় ভাড়া থাকতেন, এখন সেটাই নিজে কিনে নিয়েছেন। তারপর সেই বাড়ির নানান দেয়াল ভেঙে, বাড়িয়ে রংচং করে এখন একেবারে ঝকঝকে নতুন চেহারা। ছ্যাখো, মানুষের গ্রহের ফের। একজন ভাড়াটে থেকে সেই বাড়ির মালিক হয়ে গেল, আর একজন এত কালের ভাড়া বাড়ি ছেড়ে আবার উঠে যাবেন অন্য জায়গায়। তাও একতলা আর সেই মানিকতলা না কোন অচেনা জায়গায়।

দোতলার সবচেয়ে বড় ঘরটির সারা মেঝেতে শতরঞ্জি পাতা। সেখানে এসে বসেছে পাড়ার প্রায় পঁচিশ তিরিশজন মহিলা, কয়েকজন বেশ কম বয়েসী বউও আছে। মঙ্গলা মা বসেছেন একটি ধপধপে সাদা চাদর পাতা চৌকির ওপর, পা দুখানি ঝোলানো, দু-পাশে অনেক-গুলো তাকিয়া। মঙ্গলা মা অসম্ভব স্থূলাঙ্গিনী, মাটিতে হাঁটুমুড়ে বসতে কষ্ট হয়। এমনকি হাঁটবার সময়ও দুজন দুপাশ থেকে ওঁকে ধরে ধরে নিয়ে যায়। গায়ের রং টুকটুকে ফর্সা, ঐরকম বিরাট মোটা হলেও

মুখখানি যেন শিশুর মতন, গলার আওয়াজও খুব মিষ্টি। বয়েস বোঝা যায় না। চল্লিশ থেকে ষাটের মধ্যে যে-কোনো কিছু হতে পারে, মাথায় থাক থাক করা কালো চুল।

কল্যাণী প্রথমেই একটু চমকে উঠলেন মঙ্গলা মায়ের টকটকে পাড় লাল শাড়ি আর সিঁথিতে সিঁদুর দেখে। তাঁর ধারণা ছিল সন্ন্যাসিনীরা সিঁদুর পরেন না। কল্যাণী শুনেছেন অবশ্য, মঙ্গলামা এক সময় তাঁদেরই মতন সাধারণ এক বাড়ির বৌ ছিলেন। তারপর স্বপ্নাদেশ পেয়ে গৃহ ছেড়ে সন্ন্যাস নিয়েছেন। কাশীতে ওঁর বিরাট আশ্রম। ভক্তদের কাছ থেকে টাকা পয়সা নেন না। তবু অত বড় আশ্রম চলে কী করে কে জানে?

অন্যদের দেখাদেখি কল্যাণীও মঙ্গলা মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে দেয়াল ঘেঁষে এক কোণে বসলেন। মঙ্গলা মা অন্য একজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তারই মধ্যে কল্যাণীকে আশীর্বাদ করলেন হাত তুলে।

মঙ্গলা মা কথার মাঝে মাঝেই রামায়ণ মহাভারত থেকে ছোট ছোট গল্প বললেন। চিন্ময়ীর বড় মেয়ের বর জার্মানিতে থাকে, অনেকদিন তার কাছ থেকে চিঠি আসেনি শুনে মঙ্গলা মা বললেন, শোন তাহলে অর্জুন স্বর্গে গেছেন, অস্তর-শস্তর চালানো ভালো করে শেখবার জন্য, অনেকদিন তার কোনো খবর নেই, তখন দ্রৌপদী উতলা হয়ে বললেন...।

কল্যাণী জানে এ সমস্ত গল্প। কল্যাণী নিজেও আই-এ পর্যন্ত পড়েছিলেন সংসার যখন ছোট ছিল নিয়মিত বই পড়ার অভ্যাস ছিল। তখন দেবকুমার শুধু জন্মেছে, সে ছিল কত আদরের সন্তান। তখন তাকে মুখে গল্প শোনাবার জন্য কল্যাণী নিজে রাত জেগে জেগে মহাভারত রামায়ণ শেষ করেছেন। তবে মঙ্গলা মা গল্পগুলো বলেন ভারী সুন্দর করে।

—ও দিদি, হাত জোড় করো।

তাই তো ঘরের সবাই হাত জোড় করে মঙ্গলা মার কথা শুনছে।

এর মধ্যে কয়েকজনের বয়েস মঙ্গলা মার চেয়েও ঢের বেশী। মঙ্গলা মা-ও তো একদিন সাধারণ বাড়ির বৌ ছিলেন। আর পাঁচজনের মতন নিছক ঘর-সংসারের কাজে আটকে না থেকে বড় কাজে নেমে পড়েছেন, এখন কত লোক তাঁকে মানে গোণে, কতজনের মনে উনি শান্তি এনে দেন। নির্মলার মৃগী রোগ ছিল, মঙ্গলা মার দয়ায় নাকি এখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ। ভগবানের আশীর্বাদ ছাড়া এমন হয় না। সত্যিই কি ভগবান বলে কিছু আছে? কল্যাণীর মন বিশ্বাস অবিশ্বাসের মাঝখানে দোলে। কোনোদিন তিনি এ বিষয়ে স্থির নিশ্চিন্ত হতে পারেননি।

ঘণ্টাখানেক নানারকম উপদেশ শোনার পর ফস করে একজন বলে উঠলো, মা, আপনাকে একটা দয়া করতেই হবে। আমার ওনার খুব দরকারী কাগজপত্তর, কোর্টের সব দলিল, বাণ্ডিল করা ছিল, আর পাওয়া যাচ্ছে না। সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে, অমন কাগজপত্তর চোরে নেবে না, চাকর-বাকর চুরি করবে না। কিন্তু না পাওয়া গেলে মহা বিপদ। উনি নিজেই অন্য কোথাও ফেলে এসেছেন কিনা ঠিক নেই, কিন্তু দিনরাত আমাকে দুষছেন। মা, আপনি একটা উপায় করে দিন।

মঙ্গলা মা এবার কিন্তু কোনো পৌরাণিক কাহিনী ফাঁদলেন না। এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন প্রশ্নকারিণীর কপালের দিকে। তারপর চোখ বুজলেন।

কল্যাণীও নড়ে-চড়ে বসলেন একটু। মঙ্গলা মা-র এই দৈব ক্ষমতার কথাও তিনি শুনেছেন। যে-কোনো হারানো জিনিস উনি খুঁজে দিতে পারেন। এ ব্যাপারে ওঁর নাকি কখনো, ভুল হয় না।

মঙ্গলা মা একটু পরেই চোখ তুলে বললেন, পাবি। বাড়িতেই পাবি।

—সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে, মা। একবার নয় তিন-চারবার।

—তবু পাবি। এখনো সময় হয়নি। আজ থেকে বারো দিন পর

ঠিক পেয়ে যাবি, আমায় তখন চিঠি লিখে জানাস।

—মা, সত্যি পাবো তো? বাড়িতে যে কোনো জায়গা আর খুঁজতে বাকি নেই, সব কিছু ওলোটপালোট করে···

—ঐ তো, ঠিক আসল জিনিসের ওপরেই নজর পড়ে না। চোখ খোঁজে। কিন্তু মন খোঁজে না। মন যেদিন খুঁজবে, সেইদিনই পাবে। তোর সেই কাগজের বাণ্ডিল কোথায় আছে আমি জানি, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু বলার উপায় নেই, এখনো সময় হয়নি যে। বললাম তো বারোদিন পর যদি না পাস আমাকে জানিয়ে দিস, আমি চিঠি লিখে জায়গাটা বলে দেবো।

প্রশ্নকারিণী বর্ষীয়সী নারীটি খুব খুশী হলো না মনে হয়, তবু অবশ্য সে ভক্তি ভরে প্রণাম করলো মঙ্গলা মা-কে।

এর পর একজন বললো তার এক জোড়া সোনার দুলের কথা। মঙ্গলা মা সেইরকম কিছুক্ষণ তীব্র চোখে তাকিয়ে আবার চোখ বুজে থাকার পর বললেন, ও আর পাবি না। ও চোরে নিয়ে গেছে। আমি তো আর পুলিশ নয় মা যে চোর ধরে আনবো।

কয়েকটি হারানো জিনিসের কিন্তু খোঁজও পাওয়া যেতে লাগল। একজন জিজ্ঞেস করলো তার ব্যাঙ্কের লকারের চাবির কথা। মঙ্গলা মা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এক মুখ হেসে উত্তর দিলেন ওটার তো পাবার সময় হয়ে গেছে। পাসনি এখনো? যা ধোপার হিসেবের খাতাটা খুলে দেখ। ওর মধ্যে ভুল করে রেখেছিলি যে।

সেই মহিলাটি তক্ষুনি ছুটে বেরিয়ে গেল এবং একটু পরেই ফিরে এসে বিস্ময় ভাঙা হাস্যোজ্জ্বল মুখে বললো, সত্যি মা, সব জায়গায় খুঁজেছিলাম শুধু ঐ খাতাটাই—

মঙ্গলা মা খুব কম জনকেই বললেন যে পাওয়া যাবে না। তাঁর কাছে যেন সময়টাই বড় কথা। কারুর এখনো সময় হয় নি। কারুর হয়েছে। কারুকে তিনি এক সপ্তাহ বা এক মাস পরের তারিখ দিতে লাগলেন আবার দু-একজনের সময় পেরিয়ে গেছে বলে দিলেন তাৎক্ষণিক সন্ধান। হারের লকেটের চুনি পাওয়া গেল ছাদের ট্যাঙ্কের

নিচে, আর একজনের ছবির অ্যালবাম আবিষ্কৃত হলো তার বাপের বাড়িতে। ঠিক যেন টেলিপ্যাথীর মতন মঙ্গলা মা এদের প্রত্যেকের চোখের দিকে তাকিয়ে লুপ্ত মনের কথা টেনে বার করছেন।

—দিদি, তুমি কিছু জিজ্ঞেস করবে না?

বিজনের মায়ের কথা শুনে কল্যাণী লজ্জা পেয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, না না।

উপস্থিত মহিলারা ঠিক ধর্ম উপদেশ শুনতে আসে নি। মঙ্গলা মায়ের কাছ থেকে হারানো জিনিসের সন্ধান জেনে নেওয়াই আসল উদ্দেশ্য। কল্যাণীও ভাবছিলেন, তাঁর কোনো হারানো জিনিসের কথা বলবেন কিনা। কিন্তু তাঁর মনেই পড়ছে না কোনো জিনিসের কথা। শিগগিরই তাঁর সেরকম দরকারী বা দামী জিনিস তো হারায় নি। একটা যা মনে আসছে, তা মুখে আনা যায় না।

দিন তিনেক ধরে তিনি কয়লা ভাঙা হাতুড়িটা খুঁজে পাচ্ছেন না। বহুদিনের একটা পুরনো লোহার হাতুড়ি অতি তুচ্ছ জিনিস। সেটা কে নেবে? কয়লা রাখার আলাদা জায়গা নেই, থাকে ছাদের এক কোণে, বহু দিন ধরেই সেখানে হাতুড়িটা ছিল। জিনিসটা খুবই সামান্য হলেও দরকারের সময় না পেলে খুবই অসুবিধে হয়। ঐ হাতুড়ির কাজ আর অন্য কিছু দিয়ে হয় না। একটা হাতুড়ি হারালে কি কেউ চট করে বাজার থেকে আর একটা হাতুড়ি কেনে? সবচেয়ে বড় কথা হলো, হাতুড়িটা হারাবে কেন?

কিন্তু মঙ্গলা মার কাছে কয়লা ভাঙা হাতুড়িটার কথা বললে সবাই হেসে উঠবে না?

মঙ্গলা মা কল্যাণীর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে খুব আস্তে আস্তে বেদনাচ্ছন্ন গলায় বললেন, তোর যা হারিয়েছে, আমি জানি, তুই আর তা ফিরে পাবি না!

কল্যাণীর বুকটা কেঁপে উঠলো।

উনি কী হারাবার কথা বলছেন? উনি কি বুঝে ফেলেছেন কল্যাণীর মনের কথা? তা কখনো সম্ভব? আর সামান্য একটা কয়লা

ভাঙা হাতুড়ির কথা টের পেলেই বা উনি সেটা সম্পর্কে অমন দুঃখিত গলায় বললেন কেন, তুই আর তা ফিরে পাবি না।

কল্যাণী মঙ্গলা মায়ের চোখ থেকে চোখ সরাতে পারছেন না। তাঁর হৃদয়ে যেন বিশাল একটা সমুদ্রের ঝাপটা এসে লাগছে। এমন অভিজ্ঞতা তাঁর আর কখনো হয়নি। এত লোকের মাঝখানে কল্যাণী বুঝি হঠাৎ কেঁদে ফেলবেন।

মঙ্গলা মা আবার বললেন, ভুলতে পারবি···আমার আশ্রমে আসিস, আমি একটা মন্ত্র দেবো···ভুলতে পারবি, ভুলতে পারবি, না ভুলতে পারলে বড় কষ্ট ··

হয়তো দুজনের মধ্যে একটা সম্মোহনী প্রবাহ আরও কিছুক্ষণ চলতে পারতো, কিন্তু এর মধ্যে অন্য কেউ আর একটা কথা বলতেই সেটা ভেঙে গেল। কে যেন একজন বললো, মা, একবার আমাদের বাড়িতে পায়ের ধুলো দিতে হবে, আমার মেয়েটার অসুখ, সে আসতে পারেনি—

কল্যাণী উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, আমি একটু আসছি।

মঙ্গলা মাকে প্রণাম না করেই তিনি বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর শরীর ঝিমঝিম করছে, তিনি কিছুতেই আর বসে থাকতে পারছিলেন না। সোজা রাস্তায় নেমে এসে তিনি হাঁটতে লাগলেন বাড়ির দিকে। মঙ্গলা মা কী হারাবার কথা বললেন? সব, সব। কল্যাণীর জীবনে তো আর কিছুই নেই, সবই তো হারিয়ে গেছে! কিছুই আর ফিরে পাওয়া যাবে না। উনি ঠিক ধরেছেন।

নিজেদের বাড়ির দরজায় পা দিয়ে কল্যাণী একটু সামলে নিয়ে ভাবলেন, না, না, তাঁর জীবনের কথা মঙ্গলা মা জানবেন কী করে? ওঁরা এরকম আন্দাজে ঢিল মারেন। সবারই জীবনে কিছু না কিছু হারিয়েছে···।

মাদ্রাজী বৌ-এর কাছ থেকে চাবির কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়ে তিনি ওপরে উঠে এলেন। ফ্ল্যাটের দরজা খোলা। টোটো ফিরে এসেছে। ঘরে উঁকি মেরে তিনি দেখলেন, টোটো চিৎ হয়ে শুয়ে

আছে খাটে, মায়ের উপস্থিতি টের পেয়েও সে ফিরে তাকালো না।

—তুই খেয়েছিস ?

—আমি বাইরে থেকে খেয়ে এসেছি।

—বাইরে থেকে ? কেন ? কোথায় খেয়েছিস ?

—খেয়েছি এক জায়গায়।

—কোথায় গিয়েছিলি ?

—এক জায়গায় দরকার ছিল।

টোটো কথা বলার মেজাজে নেই। কল্যাণী জানেন, আর দু' একটা প্রশ্ন করলেই ছেলে বলবে, আঃ এখন বিরক্ত করো না।

রান্নাঘরে এসে দেখলেন, খাবার যেমন ঢাকা দেওয়া ছিল, সেই রকমই রয়েছে। এমনও হতে পারে, টোটো বাইরে থেকে কিছু খেয়ে আসেনি, বাড়িতে ফিরেও খায় নি। সে ঠাণ্ডা খাবার খেতে পারে না। মা তার খাবার আগলে বসে থাকেনি, সে ফেরামাত্র সব যত্ন করে গরম করে দেয়নি, সেই জন্য ছেলের অভিমান হয়েছে ? এদিকে ওর বাবা সব সময় বলেন, ছেলেকে আর লাই দিয়ে মাথায় তুলো না। এক সময় তো ওর সর্বনাশ করতে বসেছিলে।

টোটো আজকাল কোনো কথাই শোনে না। সে যখন তখন যেখানে খুশী চলে যায়। জিজ্ঞেস করলে সঠিক উত্তর দেয় না। বেশী বকুনি দিলে সে বলে, তোমরা কি চাও আমি বাড়ি থেকে একেবারে চলে যাই ? তা হলে তোমরা খুশী হও ?

—ভাত গরম করে দেবো ? খাবি ?

—বললাম তো খেয়ে এসেছি।

—বেশ করেছিস খেয়েছিস। উঠে আর চারটি খেয়ে নে।

—না।

কল্যাণী রাগ করে নিজের ঘরে চলে এলেন। না খাবে তো না খেয়েই থাকুক। কী আর করা যাবে !

কারেন্ট নেই। কিন্তু গরমের চেয়েও আর এক নিদারুণ অস্থির-তায় ছটফট করতে লাগলেন কল্যাণী।···সব কিছু হারিয়ে গেছে ··

আর ফিরে পাওয়া যাবে না। এই সত্যটা কল্যাণীর মধ্যে ঘুমন্ত ছিল, কেন জাগিয়ে দিলেন মঙ্গলা মা? আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছেন! অথচ এতে যে মানুষের কতখানি ক্ষতি হয়···। আবার অনেকে নাকি ওঁদের কাছে গিয়ে শান্তি পায়, কল্যাণীও শান্তি চাইতে গিয়েছিলেন···

টোটো বাইরে থেকে সত্যই খেয়ে এসেছে! পয়সা পায় কোথায়? আর পয়সা পেলেও, বাড়িতে রান্না হয়েছে, কেনই বা বাইরে খেতে যাবে? মাত্র আঠার বছর বয়েস, এরই মধ্যে টোটো যেন কত দূরের মানুষ, ঐ বয়েসে দেবু এরকম ছিল না মোটেই···। দেবুর সঙ্গে দেখা হয় না একমাস, প্রায়ই অফিসের কাজে বাইরে যায়···আগে প্রত্যেক বুধবার বিকালে আসত, পর পর চার বুধবার আসেনি, সময় পায় না, অথচ এপাড়া আর ওপাড়া···

সদ্য স্কুল ছেড়ে এ-বাড়িতে নতুন বউ হয়ে এসেছিলেন কল্যাণী। তখন শ্বশুর শাশুড়ী থাকতেন দেশের বাড়িতে। প্রথম থেকেই নিজের সংসার। স্কুলে ফাংশানে বিদায় অভিশাপ গীতিনাট্যে কল্যাণী দেবযানী সেজেছিলেন। বিয়ের পর স্বামী বলেছিলেন, তুমি গান বাজনার চর্চা করো না, ছাড়বে কেন? প্রিয়নাথ নিজে কল্যাণীকে নিয়ে গিয়েছিলেন রেডিও স্টেশনে, তখন যুদ্ধের ডামাডোল, কল্যাণী একবারেই চান্স পেয়ে গেলেন। তারপর টানা পাঁচ বছর কল্যাণী রেডিওতে গান গেয়েছেন। সেকথা এখন বোধ হয় কারুর মনেই নেই। চার সন্তানের জননী এই মধ্যবয়স্কা গিন্নীবান্নী মহিলাটি যে এককালে বেতারের গায়িকা ছিলেন, সেকথা বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না।

দেবু হওয়ার পরই কল্যাণীকে গান বাজনা ছেড়ে দিতে হয় আস্তে আস্তে। তবু দেবু বরাবরই শান্ত, ছেলেবেলায় তাকে নিয়ে বেশী ঝামেলা পোহাতে হয় নি, কিন্তু ভুটানীটা বড় জ্বালিয়েছে, জন্ম থেকে ছিঁচকাঁদুনে আর পরপর অসুখে ভুগেছে। তখন এক এক সময় কল্যাণীর মনে হতো বাড়িতে শাশুড়ী বা ননদ কেউ থাকলে ভাল হতো। কেউ ছিল না, মাইনে দিয়ে লোক রাখারও ক্ষমতা ছিল না,

সব সামলাতে হয়েছে কল্যাণীকে একলা। সেই অবস্থায় গান গলা ছেড়ে ভয়ে পালিয়েছে একশ মাইল দূরে। ছেলেমেয়েদের জন্ম গান ছাড়তে হলো কল্যাণীকে, সেই ছেলেমেয়েরা আজ কোথায়! ভুটানী থাকে কানাডায়, হু'মাসে একখানা চিটি লেখে আর দেবু কলকাতায় থেকেও···

···তোর যা হারিয়েছে···তা আর তুই ফিরে পাবি না···! সবই তো হারিয়ে গেছে, আর কি আছে জীবনে?

প্রিয়নাথ একদিন রাগ করে বলেছিলেন, নিজে তো রোজগার করোনি কখনো, তাহলে বুঝতে টাকা পয়সা কি ভাবে আসে। মাসের শেষে প্রায়ই খিটমিটি বাধে। এক একসময় কল্যাণীর কান্না পেয়ে যায়। নিজের জন্য কখনো কিছু খরচা করেছেন তিনি? শাড়ি গয়নার শখ কোনো কালেই ছিল না। নিজের বিয়ের সময়কার গয়না কিছু গেছে বড় মেয়ের বিয়েতে, কিছু বিক্রি করতে হয়েছে দেবুর অসুখের সময়। বি. এ পরীক্ষার বছরে দেবু তো—টাইফয়েডে প্রায় মরতে বসেছিল। টাকা পয়সা নিজে রোজগার করেননি বটে কল্যাণী কিন্তু সারা জীবন ধরে যে এ সংসারের ঝি-চাকর-বামুনের খরচ বাঁচিয়ে এলেন! গলা দিয়ে এখন আর একদম সুর বেরোয় না, গানের চর্চাটি রাখলে গানের টিউশনি করতে পারতেন এখন।

···তুই যা হারিয়েছিস—তা আর ফিরে পাবি না!

ছেলেমেয়েরা, স্বামী, কেউই আর আপন নেই। প্রিয়নাথের সঙ্গে তো দিনের পর দিন কোনো কথাই হয় না। মানুষটা ভীষণ বদলে গেছে। যেটুকু সময় বাড়িতে থাকে গুম মেরে থাকে। আর হুবছর বাদে রিটায়ার করবে, সেই চিন্তাটাই বোধহয় মনের মধ্যে কাঁটা হয়ে আছে। চাকরি থেকে তো সকলকেই একদিন না একদিন রিটায়ার করতে হয়। সারাজীবন একটানা খাটুনি গেল।

শুয়ে ছিলেন, কল্যাণী হঠাৎ উঠে বসলেন। ভীষণ অস্থির লাগছে। যতই অন্য কথা ভাবতে চাইছেন, ততই বার বার ফিরে আসছে ঐ কথাটা তুই যা হারিয়েছিস···তা আর ফিরে পাবি

না । মঙ্গলা মা না ডাইনী। কে বলতে বলেছিল এই কথা।

উঠে এসে টোটোর ঘরে উঁকি দিলেন আবার। টোটো—ঘুমিয়ে পড়েছে। ছেলেটা রাগ করে না খেয়ে রইলো। কল্যাণীর নিজের পেটের মধ্যে গুলিয়ে উঠলো। ছেলে খায়নি, তিনি নিজে খেয়েছেন, আগে কখনো বাড়ির সকলের খাওয়া না হলে নিজে খেতেন না। ছেলেকে আজ শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন, উল্টে সে-ই শাস্তি দিল।

—টোটো, ওঠ লক্ষ্মী, একটু খেয়ে নে।

টোটো প্রথমে চোখ মেলে তাকালো। সরল কৈশোরের চোখ। তারপরই বিরক্তিতে ভাঁজ হয়ে গেল মুখখানা।

—বললাম না খাবো না? একটু ঘুমোতেও দেবে না?

দ্বিতীয়বার আর অনুরোধ করলেন না কল্যাণী। বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। তারপর ফ্ল্যাটের দরজা খুলে সিঁড়িতে। সিঁড়ি দিয়ে নিচে। গলি থেকে বড় রাস্তায়। তারপর যে-কোনো একদিকে হাঁটতে লাগলেন।

শহরের রাস্তায় অনেক সময় একটা একলা মোষকে দৌড়োতে দেখা যায়। মনে হয় যেন সেই জঙ্গলের প্রাণীটি এই শহর ছেড়ে আবার সেই জঙ্গলে ফিরে যেতে চাইছে। কল্যাণীর চোখের দৃষ্টিও সেই-রকম উদ্‌ভ্রান্ত। কিন্তু কল্যাণী কোথায় ফিরে যাবেন? তাঁর বাপের বাড়ি ছিল বর্ধমানে, বাবা মা নেই অনেকদিন, দাদারা খোঁজ নেয় না।

কল্যাণী কাঁদছেন না, কিন্তু চোখের খুব আনাচে-কানাচে অপেক্ষা করে আছে কান্নার ঢল, ঠোঁট কাঁপছে, তাঁর পাগলের মতন চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে, ওগো, আমার সব কিছু হারিয়ে গেছে। আমার আর কিছু নেই, কিছু নেই। আমি আর কিছু ফিরে পাবো না।

পথ দিয়ে কত মানুষ যায়। সকলেই থাকে যে-যার খেয়ালে। কেউ কারুর দুঃখ বোঝে না। পঞ্চাশ বাহান্ন বছরের একজন মহিলা, দেখলেই বোঝা যায় ভদ্র পরিবারের, তিনি রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছেন

আপন-মনে, কেই বা বুঝবে যে ইনি বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন নিরুদ্দেশে ? কল্যাণী রাস্তা-ঘাট ভালো চেনেন না, একলা বেরোন না সাধারণত, তাই কোনদিকে চলেছেন তার কোনো আন্দাজ নেই। যদি এক্ষুনি তাঁর সামনে একটা নদী পড়তো, তিনি ঝাঁপ দিতেন সঙ্গে সঙ্গে, তাঁর জীবনের ব্যর্থতা-বোধ এখন এত তীব্র।

—মাসীমা, ভাল আছেন ?

কল্যাণী থমকে গেলেন। তুটি ছেলে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ঠিক ছেলে না, যুবক, বছর তিরিশেক বয়েস, একজন জ্বলন্ত সিগারেট স্বদ্ধ বাঁ হাতখানা পিছনে বেখেছে।

কল্যাণী ওদের চিনতে পারলেন না ঠিক। যদিও মুখের আদলে খানিকটা পরিচয়ের ইঙ্গিত আছে। নিশ্চয়ই তাঁর স্বামীর ছাত্র। প্রতি বছর কত ছাত্র আসে যায়।

—হ্যাঁ বাবা, ভালো আছি।

যুবক তুটি প্রণাম করবে কি করবে না এই নিয়ে ইতস্তত করছিল। পরস্পরের চোখের দিকে তাকালো। তারপর নীচু হয়ে ঝুপ করে কল্যাণীর পায়ে হাত দিল।

—থাক থাক।

—স্যার কেমন আছেন ?

—ভালো।

—আমাদের চিনতে পারছেন তো ? আমরা আপনাদের বাড়িতে গিয়ে পড়তাম।

—হ্যাঁ এবার মনে পড়েছে।

ছেলেতুটি যেন কল্যাণীর ঘোর ভেঙে দিল। তিনি পথ দিয়ে একলা জোরে জোরে হাঁটছিলেন বলে এবার লজ্জা পেয়ে গেলেন।

—কোথায় যাচ্ছিলেন মাসীমা ?

—এই একটু এদিকে।

ছেলে তুটি চলে যাবার পর কল্যাণী হাঁটতে লাগলেন আস্তে আস্তে। আমি কোথায় যাচ্ছি ? এটা কোন রাস্তা ?

রাস্তার পাশে একটা কালী মন্দির। ভেতরে ঘণ্টা বাজছে। সামনের চাতালে অনেক নারী পুরুষ বসে আছে। কল্যাণী সেখানে থমকে দাঁড়ালেন। এখানে মানুষ আসে শান্তির জন্য। কল্যাণী একবার ভাবলেন চটি খুলে তিনিও অন্যদের পাশে বসবেন। প্রত্যেক-দিন বিকেলে এখানে চলে এলে কেমন হয়?

কিন্তু একটা জোরালো চুম্বক কল্যাণীকে পেছন থেকে টানছে। বারবার মনে পড়ছে বাড়ির কথা। যে ছেলের ওপর রাগ করে চলে এসেছেন, সেই টোটোর দৃষ্টিটাই ভাসছে চোখের সামনে। টোটো রাগ করে শুয়ে আছে, খায়নি।

আমার ভক্তি নেই। আমার বয়সী স্ত্রীলোকেরা অনেকেই পুজো-আচ্চা নিয়ে থাকে, ঠাকুর-দেবতাদের কাছে মনের ব্যথা নিবেদন করে কিন্তু ভগবান সত্যিই আছেন কিনা আমি জানি না। কালী, দুর্গা, শিবের মূর্তিগুলো সুন্দর পুতুল ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না আমাব। আমি কী করে এখানে আশ্রয় খুঁজবো?

কল্যাণী মন্দিরে ঢুকলেন না। এখন প্রধান চিন্তা হলো, কী করে বাড়ি ফেরা যাবে? ঝোঁকের মাথায় এত দূর চলে এসেছেন, কোন্ দিকে কখন বেঁকেছেন, খেয়াল নেই। ইস, তখন ঐ ছেলে দুটিকে পথের হদিস জিজ্ঞেস করলেই হতো।

কল্যাণীর বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করছে। যদি আর কোনোদিন বাড়ি ফিরতে না পারেন? কলকাতা শহরে কত মানুষ হারিয়ে যায়। তারা কোথায় যায়? তাঁর স্বামী বিকেলে বাড়ি ফেরেন না। স্কুল থেকেই সোজা টিউটোরিয়াল হোমে। ফিরতে ফিরতে রাত দশটা। তার আগে কেউ কল্যাণীর খোঁজও করবে না। টোটো কি একবারও ভাববে, মা কোথায় গেল? মাকে খুঁজবে? মনে হয় না। সেই টোটো, দশ-বারো বছর বয়েস পর্যন্ত যাকে নাইয়ে দিতে হতো, কিছুতেই নিজে খেতে চাইতো না। দিদিরা দিলে চলবে না। মাকেই খাইয়ে দিতে হবে।

একটা রিক্‌শাওয়ালাকে কল্যাণী জিজ্ঞেস করলেন, বাবা রাজবল্লভ

পাড়া চেনো? যেতে পারবে?

রিক্‌শাওয়ালাটি তৎক্ষণাৎ জানালো যে সে পারবে।

কল্যাণী অবাক হয়ে গেলেন। তা হলে কি খুব বেশী দূরে আসেননি? অথচ মনে হলো যেন অনেকখানি রাস্তা, কত ঘন্টা যেন কেটে গেছে।

বাড়ি ফিরে দেখলেন, টোটো তখনও সেই একই ভাবে ঘুমোচ্ছে। ফ্ল্যাটের দরজা খোলা, চোর এসে সর্বস্ব চুরি করে নিয়ে যেতে পারতো। কল্যাণীর এই ছোট্ট অ্যাডভেঞ্চারটুকুর কথা আর কেউ জানলো না।

॥ ৫ ॥

অধ্যাপক তিমির দাশগুপ্ত তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের বলে দিয়েছেন যে কলেজের বাইরে পথেঘাটে দেখা হলে তারা যেন তাঁকে স্যার না বলে তিমিরদা বলে ডাকে। একদিন তাঁর একটি ছাত্র গোলপার্কের কাছে তাঁকে দেখে সিগারেট লুকোচ্ছিল, তিমির দাশগুপ্ত সরাসরি তার কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন ন্যাকামি করো না। সিগারেট যদি খেতেই হয়, তবে লুকোবার কোনো দরকার নেই। আর যদি সিগারেট খাওয়াটাকে একটা অন্যায় মনে করো, তা হলে খেও না।

ছেলেটি অমনি জিজ্ঞেস করলো, তাহলে আপনিই বলে দিন, সিগারেট খাওয়া অন্যায় না ন্যায়।

খাওয়ার সঙ্গে ন্যায় অন্যায়ের কোনো প্রশ্ন নেই। কেউ মিষ্টি খেতে ভালোবাসে, কেউ ভালোবাসে টক কিংবা ঝাল। তবে, আমি মনে করি সিগারেট খাওয়াটা স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ।

—আপনি যে খান, স্যার।

—স্যার নয়, তিমিরদা। আমি চব্বিশ ঘন্টার জন্য কলেজের মাস্টার নই। কলেজের বাইরে আমার অন্য পরিচয় আছে। আমার নাম তিমির। হ্যাঁ, আমি সিগারেট খাই এবং নিজের ক্ষতি করি।

ডায়াবিটিস-এর রুগী যেমন লুকিয়ে রসগোল্লা খায়। তুমি তোমার নিজের ক্ষতি করবে কি না সেটা নিজেই ঠিক করো।

ছাত্ররা তিমির দাশগুপ্তের সামনে বা আড়ালে প্যাঁক দিতে পারে না। কারণ উনি ছাত্রদের ভয় পেয়ে তোষামোদও করেন না আবার চোখও রাঙান না। সব সময় এগিয়ে গিয়ে নিজে থেকেই ওদের সঙ্গে কথা বলেন। তবে, রাজনীতির ব্যাপারে উনি বাম ঘেঁষা হলেও খানিকটা ধরি মাছ না ছুঁই পানির ভাব আছে বলে কিছু ছাত্র ওঁকে সন্দেহের চোখে দেখে।

ছাত্র হিসেবে ব্রিলিয়াণ্ট ছিলেন তিমির দাশগুপ্ত। এম এস-সি ; কেমিষ্ট্রিতে ডক্টরেট পাবার পর পোস্ট ডক্টরেট করবার জন্য লণ্ডন গিয়েছিলেন। সেখানে মন টেকেনি, চাকরি পেয়ে বিলেতে থেকে যাবার সুযোগ পেয়েও নেননি, দেশে ফিরেও কমার্শিয়াল ফার্মে বেশী মাইনের চাকরির জন্য উমেদারি না করে কলেজের অধ্যাপনা বেছে নিয়েছেন।

তাঁর মুখে চোখে রয়েছে একটা আদর্শের দীপ্তি। সত্যিই কলেজের বাইরে তাঁর অন্য পরিচয় আছে। আধুনিক নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। কক্ষনো প্যাণ্ট পরেন না, কলেজে সাদা ধুতি পাঞ্জাবি, বাইরে গেরুয়া পাঞ্জাবি ও পাজামা। যেমন প্রায়ই হয়, একটি নাটকের দল ভালোভাবে গড়ে ওঠার পর তিনচার বছরের মধ্যেই দু টুকরো হয়ে যায়, সেই রকম একটি ভাঙা দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন এখন তিমির দাশগুপ্ত। দল ভাঙা যে খুব স্বাভাবিক ঘটনা, এটা তিনি তাঁর অনুগত সহ শিল্পীদের বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, এটাই স্বাস্থ্যের লক্ষণ। সত্যিকারের প্রতিভাবান মানুষ একটা দলে শুধু একজনই থাকতে পারে। একাধিক প্রতিভাবান মানুষ পাশাপাশি মিলেমিশে বেশীদিন কাজ করতে পারে না। এ বিষয়ে তো রবীন্দ্রনাথই খুব সুন্দরভাবে লিখে গেছেন......দুই বনস্পতি মধ্যে রাখে ব্যবধান..... লক্ষ লক্ষ তৃণ একত্রে মিলিয়া থাকে বক্ষে বক্ষে লীন..."। অবশ্য তিমির দাশগুপ্ত এখনো বনস্পতির পর্যায়ে উঠতে পারেন নি।

বিলেতে কয়েক বছর নষ্ট করার ফলে তিনি শুরুই করেছেন কিছুটা দেরিতে। তবে তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে অনেক নতুন ছেলেমেয়েই মুগ্ধ।

দল ভাঙার পর মূল শাখাটিই অফিস ঘর দখলে রেখেছে, তিমির দাশগুপ্ত নতুন অফিস ঘরের ব্যবস্থা করতে পারেননি বলে সাময়িক-ভাবে তাঁর বন্ধু রমেনের বাড়ির প্রশস্ত বৈঠকখানাটি ব্যবহার করছেন। এখানেই মহলা শুরু হয়েছে নতুন নাটকের।

রমেনের বোন অর্পিতা আর জাপানী এক সঙ্গে পড়ে। অর্পিতার সঙ্গে দেখা করতে এসেই জাপানীর সঙ্গে আলাপ হলো তিমির দাশ-গুপ্তর। সামান্য আলাপ ও সৌজন্য বিনিময়। একটা নতুন শব্দ শোনার পর যেমন প্রায়ই সেটা নানান জায়গায় চোখে পড়ে, সেই-রকমই তিমির দাশগুপ্তের সঙ্গে আলাপ হবার পর এক মাসের মধ্যে তিনবার তাঁর সঙ্গে জাপানীর দেখা হয়ে গেল রাস্তায়। চোখাচোখি এবং দু'একটি মাত্র কথা। ছাত্রীস্থানীয়া বলে তিমির প্রথম দিন থেকেই জাপানীকে তুমি বলে সম্বোধন করেছিলেন।

তারপর হঠাৎ এক রাত্রে জাপানীও ঐ তিমির দাশগুপ্তকে স্বপ্ন দেখে ফেললো। ঐ স্বপ্নের বিষয়বস্তুতে এমন কিছু ছিল, যে জন্য জাপানী বেশ লজ্জা পেয়ে গেল সকালবেলা। তার ঠিক দু'দিন পরই তিমিরকে আবার জাপানী দেখলো বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে, আর দু' তিনটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে তিনি খুব মগ্নভাবে কথা বলতে বলতে যাচ্ছিলেন, তাই জাপানীকে লক্ষ্য করেননি। কিংবা, জাপানীর মনে হলো, তিমির দাশগুপ্ত তাকে একবার ঠিকই দেখেছেন, তবু ইচ্ছে করে কথা বলেননি।

সেদিন বিকেল পাঁচটা পঁচিশে বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে জাপানী অভিমানাহত হৃদয়ে ভাবলো, তিমির দাশগুপ্তর মতন চমৎকার মানুষ সে আর দেখেনি জীবনে। লম্বা, সুন্দর চেহারা, উদাসীন চোখ, গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

সুতরাং জাপানী ঘন ঘন যাওয়া শুরু করলো অর্পিতার বাড়িতে।

পরপর সাতদিন গিয়েও তিমির দাশগুপ্তর দেখা পেল না। সন্ধের পরও বসবার ঘর ফাঁকা। তিমির দাশগুপ্তর আজ তাঁর দল নিয়ে কল শো করতে গেছেন রাণীগঞ্জের ওদিকে কয়লাখনি অঞ্চলে।

তারপর এক শনিবার বিকেলবেলা আবার অর্পিতার বাড়িতে গিয়ে জাপানী দেখলো বৈঠকখানা ঘরে জমাট রিহার্সাল চলছে। বৈঠকখানার মধ্য দিয়েই জাপানীকে দোতলায় অর্পিতার কাছে যেতে হবে, সে ইতস্তত করতে লাগলো। চেয়ার টেবল সব সরিয়ে ফেলা হয়েছে, মেঝেতে নানারকম খড়ির দাগ কাটা। একজন অভিনেতা পা মেপে মেপে একটা খড়ির দাগ পর্যন্ত এসেই ঘুরে দাঁড়িয়ে কান্না-ভেজা গলায় বললো, আমি জানতাম! আমি জানতাম, এরকম হবে!

ঘরের এক কোণে একটা বেতের মোড়ার ওপর বসে আছেন তিমির দাশগুপ্ত। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন টাইমিং। দশ সেকেণ্ড পজ হবে। মনে মনে দশ গুণে···। তারপর জাপানীকে দেখেই তিমির দাশগুপ্ত ব্যগ্র হয়ে উঠে এসে খুব কোমল গলায় জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছো? অনেক দিন দেখিনি তোমাকে।

জাপানীর বুক কেঁপে উঠলো।

তিমির দাশগুপ্ত সকলের দিকে ফিরে বললেন, ঠিক এরকম একটা মুখ খুঁজছিলাম. চোখ দুটোতে সরল সরল ভাব আছে, একটা গ্রামের মেয়ে হিসাবে······বিন্তির চরিত্রে মানাবে না?

বিস্ময়ে অনড় জাপানীর হাত ধরে টেনে এনে তিনি ঘরের মাঝ-খানে দাঁড় করালেন. থুতনিতে আঙুল দিয়ে বললেন, একটু উঁচু করো মুখটা! বাঃ, ঠিক আছে। শম্ভু. এদিকে আয় তো, এর সামনে দাঁড়া!

অন্য একটি ছেলে এসে জাপানীর সামনে দাঁড়াতেই তিমির অত্যন্ত খুশী গলায় বললেন, এই তো, হাইটও ঠিক আছে। পারফেক্ট! তুমি আমাদের দলে অভিনয় করবে, কী যেন তোমার নাম?

জাপানী বললো, আমি? আমি অভিনয় করবো?

—হ্যাঁ। তোমাকে আমাদের দরকার।

—আমি অভিনয়ের কী জানি!

ছ' তিনটি ছেলে প্রায় একসঙ্গে বললো, সে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। তিমিরদা শিখিয়ে দেবেন।

এরপর জাপানী একটা খুব ছেলে-মানুষের মতন কাণ্ড করলো। না, না না! সে না না বলতে বলতে এক দৌড়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

দোতলার ঘরে অর্পিতা জিজ্ঞেস করলো, তুই হাঁপাচ্ছিস কেন?

জাপানী হাসতে হাসতে বললো, কী সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার, আমাকে বলে কিনা অভিনয় করতে! তোদের ঐ তিমিরদা।

অর্পিতা বললো, তা এত ভয় পাবার কী আছে? কর না থিয়েটার!

—তুই পাগল হয়েছিস? বাবা আমাকে একেবারে কেটে ফেলবেন না? তুই করছিস না কেন? তোদের বাড়িতেই রিহার্সাল।

অর্পিতা ঠোঁট উল্টে বললো, আমার ওসব ভালো লাগে না। রোজ রোজ সন্ধেবেলা ঐ একঘেয়ে পার্ট বলা···থিয়েটার কেন ইচ্ছে থাকলে আমি তো সিনেমাতেই নামতে পারতাম···তপনবাবু একবার ওঁর একটা ছবির জন্য আমাকে চেয়েছিলেন, আমি রাজি হইনি।

অর্পিতা মেয়েটি একটু শৌখিন ধরনের। সারাদিনে তিনবার স্নান করে। মাসে পাউডারও খরচ করে তিন কৌটো। সে ধরেই নিয়েছে যে সে সুন্দরী এবং সমস্ত পুরুষরা তার স্তুতি করবে। ইতিমধ্যে দুবার প্রেম করা হয়ে গেছে। এসব প্রেম হচ্ছে ট্রেনিং-এর মতন, যাতে জীবনের চূড়ান্ত প্রেমটি সর্বাঙ্গ সুন্দর হতে পারে। অর্পিতার মতন মেয়েরা কখনো নিছক ভালোবাসার জন্য কারুকে বিয়ে করে না। জীবনে ভালোবাসার স্থান এক পঞ্চমাংশ মাত্র। জাপানীর দিদি ক্যানাডায় থাকে শুনে অর্পিতা বলেছিল, বিদেশে থাকে এমন কারুকেই সে বিয়ে করবে—একথা সে ছেলেবেলা থেকেই ঠিক করে রেখেছে।

কিছু লজ্জায় এবং অনেকখানি ভয়ে জাপানী অর্পিতাদের বাড়িতে

আসা বন্ধ করে দিল। তিমির দাশগুপ্তকে তার খুবই দেখতে ইচ্ছে করে, কিন্তু থিয়েটার, ওরে বাবাঃ!

তবু দেখা হয়ে গেল, সেণ্ট্রাল এভিনিউতে, সন্ধেবেলা, একা। তিমির-এর সঙ্গেও কেউ নেই। জাপানী চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল, তিমির নিজেই এগিয়ে এসে বললেন, এই যে, সেদিন তুমি পালিয়ে গেলে কেন? বললাম না, তোমাকে আমার দরকার? চলো, আজকে আমার সঙ্গে চলো।

জাপানীর মুখ শুকিয়ে গেছে। সে প্রায় কাঁদো কাঁদো ভাবে বললো, আমি থিয়েটার করতে পারবো না। আপনি আমায় বিশ্বাস করুন—

তিমির দাশগুপ্ত বললেন, কী মুশকিল, তুমি চেষ্টা না করেই বলছো যে পারবে না? তুমি পারবে কিনা, সেটা তো আমরা বুঝব! তোমার নামটা যেন কী?

—মুকুলিকা সান্যাল।

—আর একটা কী যেন নাম আছে? অর্পিতা বলছিল⋯জানো তো, অর্পিতার কাছে আমি তোমার খোঁজ করেছি।

—আমার নাকটা চাপা কিনা, সেইজন্য আমার বাড়িতে সবাই আমাকে জাপানী বলে। বন্ধুরাও অনেকে জেনে গেছে।

—বাঃ জাপানীই তো বেশ সুন্দর নাম।

—আপনি আমাকে মুকুলিকা বলবেন। জাপানী বলবেন না।

টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছিল, হঠাৎ লোড শেডিং হয়ে গেল। তিমির বিরক্তভাবে বললেন, যাঃ! আজ আমাদের রিহার্সাল আছে, ঠিক এই সময়, চলো তুমি আমার সঙ্গে।

জাপানীকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তিমির আবার বললেন, তোমার রিকৃশায় চড়তে আপত্তি আছে? অনেকে আপত্তি করে কিন্তু আমি তার কোনো সেন্স খুঁজে পাই না। রিকৃশা জিনিসটা দেশ থেকে তুলে দেওয়া উচিত ঠিকই, কিন্তু যতদিন না তোলা হচ্ছে ততদিন রিকৃশা বয়কট করলে বেচারারা যে না খেয়ে মরবে! আমরা অনেক সময় তাড়াহুড়োর জন্যে একটুখানি রাস্তা ট্যাক্সিতে গিয়ে এক

টাকা আশি পয়সা ভাড়া দিই, অথচ সেইটুকু রাস্তাই রিক্শায় গেলে আট আনার বেশী দিতে চাই না। এটা একটা ক্রুয়েলটি না?…বৃষ্টি পড়ছে, তা ছাড়া অন্ধকারের মধ্যে তোমাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে চাই না…একদিন আমার পা মচকে গিয়েছিল, সেই থেকে লোড শেডিং-এর সময় কলকাতার রাস্তায় হাঁটতে আমি ভয় পাই।

ঝট করে একটা রিক্শা ডেকে তিমির বললেন, এসো!

অধ্যাপনা করেন বলে তিমিরের একটু বেশী কথা বলার নেশা আছে। এবং ঐ একই কারণে অন্যের কথা শোনার বদলে নিজেই সব কথা বলতে ভালোবাসেন।

জাপানী বললো, আমি কোথায় যাবো?

—আমরা রমেনের বাড়ি ছেড়ে দিয়েছি। বৌবাজারে একটা অফিস ঘর ভাড়া নিয়েছি। তুমি কোথায় থাকো?

—শ্যামবাজারের কাছে। রাজবল্লভ পাড়ায়।

—বাঃ, তাহলে তো কোনো অসুবিধেই নেই। ন নম্বর বাসে সোজা চলে আসতে পারবে। সপ্তাহে তিনদিন রিহার্সাল, এরপর অবশ্য আর একটু ঘন ঘন হবে।

—তিমিরদা, আমি সত্যি বলছি, আমার পক্ষে থিয়েটার করা অসম্ভব। অনেক অসুবিধে আছে।

—কী কী অসুবিধে?

—সামনেই আমার পরীক্ষা।

—ঠিক আছে, পরীক্ষার পর থেকেই, এখন চলো, দেখে আসবে জায়গাটা, তোমাকে দিয়ে দুটো লাইন বলাবো—ওঠো।

আপত্তি করার সুযোগ পেল না জাপানী তিমিরের ব্যক্তিত্বে বশীভূত হয়ে সে রিক্শায় উঠে বসলো।

—তুমি কী পরীক্ষা দেবে?

—পার্ট টু, সাইন্স।

—সায়েন্স? কী কী কম্বিনেশন? আমি সায়েন্স পড়াই তুমি জানো?

—আমার ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথামেটিকস।

—তুমি সায়েন্স পড়ছো কেন? তুমি রিসার্চ করবে?

—তা জানি না। বাবা বলেছিলেন সাইন্স নিতে।

—বাবা বলেছিলেন? পড়াশুনোটা কার, তোমার নিজের না বাবার? মেয়েরা কেন সায়েন্স পড়ে আমি বুঝতে পারি না। হয় অফিস-টফিসে কাজ করবে, নইলে বিয়ের পর আর কিছুই করবে না। অথচ তোমাদের জন্য লেবরেটরি লাগবে, ডিমনস্ট্রেটর রাখতে হবে, শুধু শুধু বাজে খরচ, এসব তোমাদের জীবনের কোনোই কাজে লাগবে না। অবশ্য যদি কারুর বিজ্ঞানের দিকে ঝোঁক থাকে···কিন্তু সেরকম ক'জন মেয়ের থাকে?

জাপানী কখনো এর আগে কোনো অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে রিক্‌শা চেপে যায় নি। আজ সে উঠছে তাঁর স্বপ্নের যুবরাজের সঙ্গে। কিন্তু তিনি পড়াশুনোর কথা তুলে অনবরত বকুনি দিচ্ছেন।

—অঙ্কে কত পেয়েছিলে আগের পরীক্ষায়?

—একচল্লিশ

—ছি, ছি। অঙ্কে এত কাঁচা হলে কখনো বিজ্ঞান পড়া উচিত? রং সিলেকশান। অধিকাংশ ছেলেমেয়েরই এটা হয়। অভিভাবকেরাও কিছু চিন্তা করেন না—কোনোরকমে বি এস সি পাস করলে কী লাভ হবে?

—আর্টস পড়লে চাকরি পাওয়া যায় না।

—হায় রে আমার পোড়া দেশ! সবই কেরানীর চাকরি, তবু সেখানেও আর্টসের চেয়ে সায়েন্সের দাম বেশী!

রিক্‌শাগুলো এমনভাবে তৈরি যে দু'জন বসলে খুবই ঘেঁষাঘেঁষি হয়। জাপানী একটু আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে। তিমির একটি হাত রেখেছেন জাপানীর কাঁধের দিকে কিন্তু স্পর্শ করেননি। হঠাৎ বিজ্ঞান বিষয়ে কথা থামিয়ে তিনি বললেন, এখন দু'একদিন এসো আমাদের এখানে, পরীক্ষার পর থেকে নিয়মিত আসবে। ঠিক তোমার মতন একটি মেয়েকেই আমাদের দরকার।

জাপানী বললো, আপনি অর্পিতাকে নিচ্ছেন না কেন ? ও আমার চেয়ে অনেক ভালো পারবে !

—অর্পিতা ? উঃ হ্যাঁ, ওর কথা একবার ভেবেছিলাম, কিন্তু ওর মুখের ঠিক কোনো চরিত্র নেই।

এই ধরনের ভাষা জাপানী ঠিক বোঝে না। মুখের চরিত্র ? সে বললো, মোটেই না অর্পিতা খুব ভালো মেয়ে।

—ভালো মেয়ে ? ভালো দিয়ে আমি কী করবো ? শুধু ভালো হলে কিংবা দেখতে সুন্দর হলেই চলে না, মুখের মধ্যে একটা ব্যাপার থাকা চাই।

বৌবাজার স্ট্রীট পেরিয়ে খানিকটা এগিয়ে বাঁ দিকে রাস্তায় রিক্‌শাটা থামলো। এ পাড়াও পুরোপুরি অন্ধকার। একটা বাড়ির দরজা দিয়ে ঢুকে তিমির ফস করে দেশলাই কাঠি জ্বেলে বললেন, তিনতলায় উঠতে হবে, সিঁড়ি দিয়ে খুব সাবধানে।

মোট পাঁচটা দেশলাই কাঠি জ্বালতে হলো। এর মধ্যে একবার হোঁচট খেল জাপানী কিন্তু তিমির তাকে ধরবার জন্য হাত বাড়ালেন না। বরং হাসলেন। তিনতলায় ঠিক সিঁড়ির মুখোমুখি ঘরখানায় মোম জ্বেলে বারো চোদ্দ জন নারী পুরুষ বসে আছে। তিমির ঢুকে বললেন, আমার ঠিক পাঁচ মিনিট লেট। কিন্তু এই অন্ধকারের মধ্যে কী করে কী হবে ?

একজন কেউ বললো, খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে দেখা যাক। আধ-ঘণ্টার মধ্যে আলো না এলে এর মধ্যেই রিহার্সাল দিতে হবে।

একটু চা খাওয়া গেলে মন্দ হত না।

ওপর থেকেই একজন জানালার কাছে দাঁড়িয়ে হাঁক দিল, এই হাবলু পনেরোটা চা—

ঘরে চেয়ার টেবল কিছু নেই, ঢালাও শতরঞ্জি পাতা। নিজের পাশের জায়গাটা থাবড়ে তিমিরদা জাপানীকে বললেন, বসো। ছাখো, এই মেয়েটিকে জোর করে ধরে আনলুম। কিছুতেই আসতে চায় না।

একটি মেয়ে বললো, আপনি আসুন না ভাই। একটা রোলের জন্য আমাদের নতুন নাটকটা আটকে আছে।

জাপানী বললো, আমি আগে কোনদিন করিনি।

—আমরাও কেউ আগে করিনি। সবার সঙ্গে মিলেমিশে শুরু করলেই ভয় ভেঙ্গে যায়।

তিমির দাশগুপ্ত বললেন, আমরা তোমাকে শিখিয়ে নেবো। অবশ্য সকলকে দিয়ে অভিনয় হয় না। কয়েকদিন চেষ্টা করার পর যদি দেখি যে সত্যি তোমার হচ্ছে না, তা'হলে কি আর তোমাকে জোর করে ধরে রাখবো?

একটু থেমে তিনি আবার বললেন, আমাদের এই নাটক সাধারণ আমোদ-প্রমোদের জন্য যে নয়, সেটা তোমার আগে বোঝা দরকার। এইসব নাটকের মাধ্যমে আমরা একটা সোস্যাল মুভমেন্ট করতে চাই। দেশের প্রকৃত ছবিটা আমরা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেবো। দেখো, এখানে যারা এসেছেন, সবাই অফিস-টফিসে কাজ করেন, সারাদিন খাটাখাটুনির পরও এখানে আসেন। রিহার্সালে আসার ট্রাম বাস ভাড়া নিজেদের দিতে হয়। স্টেজ করার সময়ও প্রত্যেককে কিছু কিছু দিতে হয়। বিনিময়ে কিছুই পাবার আশা নেই। গ্রুপ থিয়েটারে কোনো আর্থিক লাভ নেই, তবে সবচেয়ে বড় লাভ হলো একটা কনস্ট্রাকটিভ কিছু করার ফীলিং। একশোটা বক্তৃতা করে যে কাজ হয়, তার চেয়ে বেশী কাজ হয় একটা নাটকের মধ্যে জীবন্ত ভাবে বক্তব্য ফুটিয়ে তুলতে পারলে।

এরপর চা এসে গেল। এবং আধঘণ্টা পার হবার পরও আলো না আসায় শুরু হলো রিহার্সাল। অন্ধকারের মধ্যে বসে বসেই শুধু সংলাপ।

একটু পরে জাপানী ফিসফিস করে তিমিরকে বললো, আমাকে এবার যেতে হবে।

—আর একটু বসো।

জাপানীর অবশ্য যেতে ইচ্ছে করছে না। ভালো লাগছে খুব।

কোনো রকম ইয়ার্কি চ্যাংড়ামি নেই, এরা প্রত্যেকেই দারুণ সীরিয়াস অনুশীলন করছে খুব মন দিয়ে। তিমির একজনকে একটা বাক্য দশবার বলতে বললেন, সে ঠিক বলে গেল, কোনোরকম বিরক্তি প্রকাশ না করে। বাড়ির বাইরের এরকম সুন্দর পরিবেশে যেন একটা মুক্তির টাটকা বাতাস আছে। বাড়িতে শুধু একটা একঘেয়ে জীবন।

হঠাৎ আলো জ্বলে উঠতেই একটা আনন্দের কলরোল উঠলো। শুধু এই ঘরের মধ্যেই নয়, রাস্তাতেও। আলোতে সবাইকে ভালো করে দেখলো জাপানী। তিনজন মহিলা, এগারোজন পুরুষ। প্রত্যেকে জাপানীর দিকে চেয়ে আছে।

তিমির দাশগুপ্ত জাপানীকে বললেন, এবার তুমি একটু ওঠো তো, তোমাকে একটু ট্রায়াল দি।

জাপানীকে উঠে দাঁড়াতেই হলো।

—তোমার একটি গ্রামের মেয়ের ভূমিকা। স্ক্রিপ্‌টটা তোমাকে পড়তে দেবো, তারপর পুরো রোলটা বুঝিয়ে দেবো। প্রথমে, তুমি ঘরের এ কোনা থেকে ও কোনা পর্যন্ত একবার হেঁটে যাও, জানো তো, শহরের মেয়ে আর গাঁয়ের মেয়ের হাঁটার ধরন সম্পূর্ণ আলাদা, সেই কথাটা ভেবে।

জাপানী আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

একটি মেয়ে বললো, লজ্জা করলে চলবে না। জোর করে লজ্জা ভাঙতে হবে।

তিমির দাশগুপ্ত সেই মেয়েটিকে বললেন, প্রভাবতী এর শাড়ীটা একটু ঠিক করে দাও তো, গ্রামের মেয়েরা যে-রকম ভাবে শাড়ী পরে। মেয়েটি উঠে এসে জাপানীর আঁচলটা নিয়ে গাছকোমর বেঁধে দিয়ে বললো, হাঁটুন···আচ্ছা আমি একবার দেখিয়ে দিচ্ছি।

মেয়েটি ঘরের এপাশ থেকে ওপাশে হেঁটে গেল, কোমরে একটা হাত দিয়ে। সেটা ঠিক গাঁয়ের মতন হাঁটা কিনা তা জাপানী জানে না। সে কবেই বা গ্রামে গেছে আর কটাই বা গ্রামের মেয়ে দেখেছে।

তবে এই মেয়েটির হাঁটা অন্যরকম, প্রতিবার পা ফেলার সময় একবার ডান কোমরটা উঁচু হয়, একবার বাঁ কোমর।

তখনও জাপানী লজ্জা পাচ্ছিল বলে মেয়েটি তাকে একবার ধরে ধরেই হাঁটিয়ে নিয়ে গেল, তারপর ছেড়ে দিয়ে বললো, এবার নিজে করো।

জাপানী এদিকে চলে আসতেই তিমিরদা বললেন, বাঃ এই তো অনেকটা হয়েছে। ঠিক আছে, এবার তু'লাইন সংলাপ বলতে হবে।

আমাকে মেরে কেটে কুচি কুচি করে ফেলতে পারো, তবু আমি কিছুতেই তোমার ঘরে যাবো না, এই কথাটাই পরপর তিনবার বলার পর তিমিরদা রীতিমতন আবেগের সঙ্গে বললেন, বাঃ, ইনটোনেশানটা অনেকটা কাছাকাছি হয়েছে। তুমি এত ভালো পারবে, আমি ভাবতেই পারিনি।

সকলের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, একে দিয়ে আমাদের ভালোই চলে যাবে, তাই না? কী মনে হয়

সকলের মুখপাত্র হয়ে প্রভাতী নামের মেয়েটি বললো, প্রথম দিনেই যথেষ্ট ভালো করেছে, একটু শিখিয়ে নিলে ও খুব ভালো পারবে।

জাপানীর শরীরে রোমাঞ্চ হচ্ছে। এতজন মানুষ এক সঙ্গে তাকিয়ে আছে তার দিকে, তার প্রশংসা করছে। সে নিছক তাদের বাড়ির বকুনি খাওয়া মেয়েই নয় শুধু। তার অন্য একটা গুণ আছে।

আরও তুটি সংলাপ বলার পর তার আরও প্রশংসা হলো। তারপর তিমিরদা বললেন, তোমার আজ এতেই হবে। কাল বাদ দিয়ে পরশু আসবে আবার। ঠিক সাতটার সময়। এবার সিন থ্রী, রতন আর মঞ্জু ওঠো।

আটটা বেজে গেছে কখন, জাপানী এত দেরি করে কখনো বাড়ি ফেরে না। আজ কপালে আছে খুব একচোট। তবু তার যেতে ইচ্ছে করছে না

রিহার্সাল চলছে পুরোদমে। জাপানী মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছে। সমস্ত

সংলাপ এদের মুখস্থ, কেউ প্রমটিং করে না, প্রতিটি পদক্ষেপ মাপা অথচ কী সাবলীল। নাটকের সংলাপ শুনলেও রক্ত চনমন করে ওঠে। একজন নারী-লোলুপ অত্যাচারী জমিদারের ওপর গ্রামের সব লোক কীভাবে একজোট হয়ে প্রতিশোধ নেবে, তার কাহিনী।

প্রভাতী একসময় তিমিরদাকে ডেকে নিয়ে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে নিম্নস্বরে কী যেন বলতে লাগলো। ভঙ্গিটা কোনো গোপনীয়-তার নয়, কাজের কথার। অনেকক্ষণ ধরে কথা চললো, এদিকে রিহার্সাল হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু জাপানী আর রিহার্সাল দেখছে না, ওদের দুজনের দিকে চেয়ে আছে। তিমিরদার পাশ ফেরা মুখখানি আরও সুন্দর দেখায়।

একসময় জাপানী ভাবলো, আমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

তিমিরদা একবার এদিকে তাকাতেই সে বললো, আমি এবার বাড়ি যাবো।

তিমিরদা বললেন, বেশ যাও। পরশু আবার এস তা হলে।

জাপানী হাতছানি দিয়ে ডেকে বললো, একবার শুনুন।

তিমিরদা এদিকে এগিয়ে আসতেই জাপানী দরজার বাইরে সিঁড়ির কাছে দাঁড়ালো। পাশাপাশি কয়েকখানা ঘর তালাবন্ধ। বারান্দায় আলো নেই।

তিমিরদা ওর কাছে এসে বললেন, কী?

জাপানী নীরব দুঃখিত মুখখানা তুলে তাকালো। অবিকল প্রেমি-কার মতন ভঙ্গি। এখন তিমিরদার বোতাম খোলা বুকে সে আঙুল দিয়ে আঁকিবুকি কাটলেই দৃশ্যটা সম্পূর্ণ হয়।

—আপনি আমায় ক্ষমা করুন। আমি এখানে আর আসতে পারবো না।

তিমিরদা দারুণ চমকে গিয়ে বললেন, কেন?

—আপনি বুঝতে পারবেন না, থিয়েটার করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার বাবা সাঙ্ঘাতিক রাগী, তিনি কিছুতেই অ্যালাউ

করবেন না, একবার যদি কোনোক্রমে জানতে পারেন।

তিমিরদা ভুরু কুঁচকে বললেন, কোনোক্রমে জানতে পারেন মানে কী? থিয়েটার তো আর কোনো গোপন ব্যাপার নয়, পাবলিক স্টেজে হবে, কখনো পাবলিসিটি থাকবে।

—সেইজন্যই তো বলছি। আমার খুবই ভালো লাগছে অবশ্য, কিন্তু কোনো উপায় নেই, অসম্ভব!

—কেন, তোমার বাবা রাজি হবেন না কেন? আমরা কি কোনো খারাপ কাজ করছি? তুমি যদি কোনো অন্যায় না করো, তাহলে সেটা তোমার বাবা মাকে জোর দিয়ে বলতে পারবে না? বাবাকে বোঝাতে হবে যে এটা সাধারণ ফুর্তির থিয়েটার না। এখানে ছেলে-মেয়েরা প্রেম করতে আসে না।

—আমার বাবাকে আপনি চেনেন না।

—কী করেন তোমার বাবা?

—স্কুলে পড়ান।

—তাহলে তো আমারই প্রফেশানের লোক, একজন স্কুল টিচারের পক্ষে তো এত কনজারভেটিভ হওয়ার কথা নয়। আমি তোমার বাবাকে বুঝিয়ে বলবো। আমি তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাবো। তোমাদের ঠিকানা কী?

—আপনি সত্যিই যাবেন? বাবা যদি আপনাকে অপমান করেন?

—কেন, অপমান করবেন কেন? আমি একজন ভদ্রলোক। একজন ভদ্রলোককে আর একজন ভদ্রলোক অপমান করবেন কেন? এ সপ্তাহে হবে না। সামনের বুধবার যদি যাই? বিকেলের দিকে?

তিমিরদা পকেট থেকে নোট বই বার করেছেন। জাপানী বাড়ির ঠিকানা বলে দিল। কোনোদিনই বিকেলে বাবা বাড়িতে থাকেন না। তবু তিমিরদা আসুক না একবার বাড়িতে। বেশ ভালো হবে।

জাপানীর মনের মধ্যে একটা অযৌক্তিক বাসনা জেগেছিল, তিমিরদা তাকে যেন রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসেন, কিন্তু তিমিরদা তা করলেন না। হাত তুলে বললেন, আচ্ছা—। পারলে পরশু

একবার এসো আমি তোমার বাবার কাছ থেকে ঠিক পারমিশন আদায় করে নেবো তোমার যখন ট্যালেন্ট আছে—

॥ ৬ ॥

মেয়ে এবং স্বামী বেরিয়ে যাবার ঠিক আধঘণ্টা বাদে অনুরাধাও বেরুলো। পরিষ্কার সাজ। হালকা নীল শাড়ি, ঠোঁটে পাতলা লিপষ্টিক, কানে দুটি ছোট দুল ছাড়া আর কোনো অলঙ্কার নেই। বাঁ হাতে ঘড়ি ছাড়া হাত দু'খানি পরিষ্কার। সে আংটিও পরে না।

একটা ট্যাক্সি ধরার পর সে দেখলো তাদের প্রতিবেশী সুনীলদা মোড়ের মাথায় ব্যস্ত হয়ে ট্যাক্সি খুঁজছেন। সুনীলদাকে সে নিজের ট্যাক্সিতে তুলে নিল। সুনীলদা যাবেন অনেক দূর, সেই জন্য তাকেই নামতে হলো আগে। ইচ্ছে করেই সে নামলো থিয়েটার রোডে, তারপর সেখান থেকে রোল্যাণ্ড রোড পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে একটা বড় ফ্ল্যাটবাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লো। লিফটে আটতলায় এসে বেল টিপলো একটি ফ্ল্যাটের দরজায়। পর পর তিনবার।

স্লিপিং সুট পরে অত্যন্ত রূপবান একজন যুবক দরজা খুলেই অনুরাধার হাত ধরে টেনে নিল ভেতরে। ধড়াস্ শব্দে দরজাটা বন্ধ করেই সেই যুবকটি অনুরাধাকে দরজার গায়ে চেপে ধরে দীর্ঘস্থায়ী একটা চুম্বন দিল। তারপর একটিও কথা না বলে অনুরাধাকে পাঁজা-কোলা করে তুলে ধরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল তার লণ্ডভণ্ড বিছানায়।

অনুরাধা জিজ্ঞেস করলো, তোমার ঘুম ভাঙালুম?

যুবকটি বললো, হ্যাঁ, কাঁচা ঘুম।

বলেই সে অনুরাধার বুকে মুখ রাখলো।

অনুরাধা কৃত্রিম ধমক দিয়ে বললো, দাঁড়াও, আমার শাড়িটা নষ্ট হবে।

উঠে শাড়িটা খুলে সে সাবধানে পাট করে রাখলো খাটের পাশের

একটি চেয়ারের মাথায়। ব্লাউজ ও সায়া পরে সে বিছানায় ফিরে এসে বললো, চা টা খাবে না?

—পরে, পরে!

অত্যন্ত অস্থির হয়ে যুবকটি অনুরাধাকে বুকে টেনে নেবার চেষ্টা করতেই অনুরাধা বললো, এই, একটু ছাড়ো লক্ষ্মীটি।

এবার অনুরাধা যা শুরু করলো, তা হঠাৎ দেখলে ম্যাজিক বলে মনে হতে পারে। সে তার একটা হাত চোখের সামনে ধরে অন্য হাতে এক চোখে চাপ দিতে লাগলো। তারপর যেন কোনো অদৃশ্য জিনিস ধরে হাত ব্যাগের মধ্যে একটা কৌটোয় রাখলো। এরকম পরপর দুবার।

আসলে সে তার চোখ থেকে খুললো কনটাক্ট লেন্স। তারপর সে নিজেই যুবকটিকে আলিঙ্গন করে শুয়ে পড়লো।

এরপর, যদিও ওদের মনে হচ্ছিল অনন্তকাল, আসলে মাত্র এগারো মিনিটে সম্পূর্ণ খেলাটি সাঙ্গ হলো।

কিছুক্ষণ নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে রইলো দুজনে। পাশাপাশি দুটি শরীরেই কুলকুল করে ঘাম বইছে।

একটু পরে পাশ ফিরে যুবকটি আবার অনুরাধার মুখে চুম্বন করলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, বুনবুন কেমন আছে? কার কাছে রেখে এলে ওকে?

অনুরাধা বললো, ও তো স্কুলে যায় এই সময়।

—বাবাঃ, এর মধ্যেই স্কুলে? কবছর বয়েস হলো?

—সাড়ে তিন!

—পাঁচ বছরের আগে তো আমাদের হাতে খড়িই হতো না। আজকাল বোধহয় হাতে খড়ি-টড়ি না দিয়েই স্কুলে পাঠিয়ে দাও বাচ্চাদের।

—তিনবছর বয়েস হয়ে গেলে আর কোনো স্কুলে নেয় না, তুমি জানো?

বিছানা থেকেই লম্বা হাত বাড়িয়ে যুবকটি টেবিলের ওপর থেকে

সিগারেট দেশলাই নিয়ে এলো। নিজে একটা ধরিয়ে অনুরাধাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি খাবে ?

ওর হাত থেকেই সিগারেটটা নিয়ে দুবার টেনে আবার সেটা ফিরিয়ে দিয়ে অনুরাধা চলে গেল বাথরুমে। যুবকটি নীল ধোঁয়ার ওড়াউড়ির দিকে তাকিয়ে রইলো একদৃষ্টে।

এই যুবকটির নাম বিশ্বজিৎ সেনগুপ্ত। সে একটি আরবদেশের বিমান সংস্থার পাইলট, বেশীর ভাগ দিনই সে সারা পৃথিবীর আকাশে উড়ে বেড়ায়, কলকাতায় আসে দুতিন মাসে একবার।

বাথরুম থেকে ফিরে শাড়িটাড়ি পরে নিয়ে অনুরাধা জিজ্ঞেস করলো, একটু চা করি ?

এক ঘরের ফ্ল্যাট। এরই মধ্যে রয়েছে বাথরুম, ছোট রান্নাঘর এবং একটি বারান্দা। স্বয়ংসম্পূর্ণ। ভাড়া সাড়ে পাঁচশো টাকা, তবু বিশ্বজিতের সস্তাই পড়ে। কলকাতায় দুতিনদিন হোটেলে থাকলেই এর চেয়ে বেশী টাকা বেরিয়ে যায়। তা ছাড়া বিশ্বের নানা দেশে হোটেলে থেকে থেকে কলকাতায় এসে সে চায় একটা নিজস্ব আশ্রয়।

বিশ্বজিৎ বললো, ছাখো চা নেই বোধহয়। খানিকটা কফি থাকতে পারে।

অনুরাধা নিজের ব্যাগটা খুলে তার মধ্য থেকে চায়ের প্যাকেট, চিনি, বিস্কিট ইত্যাদি বার করলো। সে জানে, বিশ্বজিৎ কফি খুব একটা পছন্দ করে না। অন্যান্য দেশে কফিই বেশী খেতে হয়, চা পাওয়া গেলেও কলকাতার মতন এমন দুধ চিনি মেশানো চায়ের স্বাদ নাকি আর কোথাও নেই।

বিশ্বজিৎ মুগ্ধভাবে চেয়ে থেকে বললো, তুই কী ভালো মেয়ে রে। সব মনে করে এনেছিস আমার জন্য ? চায়ের জলটা চাপিয়ে দিয়ে আয়, আর একটু শুবি আয় আমার পাশে।

অনুরাধা ভ্রূ-ভঙ্গি করে বললো, না। এখন আমার অনেক কাজ। ঘরটা কী অগোছালো করেইনা রেখেছো !

যে মানুষ এক একদিন পৃথিবীর এক এক দেশে থাকে, সে আর ঘর গোছাতে শিখবে কী করে। গেঞ্জি, জাঙ্গিয়া, মোজা সব ঘরেই চতুর্দিকে ছড়ানো। দেখলেই বোঝা যায়, ঘরে ঢুকেই ঐ সব এক একটা জিনিস গা থেকে খুলে বিভিন্ন দিকে উড়িয়ে দিয়েছে।

দেয়ালের গায়ে লাগানো কাঠের আলমারি। অনুরাধা দ্রুত হাতে জিনিসপত্র পরিপাটি ভাঁজ করে রাখতে লাগলো তার মধ্যে। কিছু কিছু জামা প্যাণ্ট জড়ো হলো একটা বেতের ঝুড়িতে। ওগুলো কাচতে হবে।

—কাল কটায় এলে ?

বিশ্বজিৎ বললো, দমদমে পৌঁছানোর কথা ছিল বারোটার মধ্যে কিন্তু বেইরুটেই দু ঘণ্টা লেট হয়ে গেল। বাড়ি পৌঁছেছি রাত তিনটের সময়। গেট বন্ধ, দারোয়ানকে অনেক ডাকাডাকি করে খোলাতে হলো। রাত তিনটের সময় কলকাতা শহরটা একদম ঘুমিয়ে থাকে।

—কদিন থাকবে তো ?

—আমার তিনদিন ছুটি। আরও দু-একদিন বাড়াতে পারি। ভাবছি এর মধ্যে মার সঙ্গে একবার দেখা করে আসবো।

বিশ্বজিতের মা থাকেন রাউরকেল্লায় তাঁর বড় ছেলের কাছে। কিছুদিন আগে বিশ্বজিৎ তার মাকে একবার মধ্যপ্রাচ্যে ঘুরিয়ে এনেছে।

দু কাপ চা তৈরি করে ট্রেতে সাজিয়ে এনে অনুরাধা বললো, এই নিন হুজুর।

পুরস্কার হিসেবে বিশ্বজিৎ তার থুতনিতে একটা কোমল চুম্বন দিল।

বিছানায় পাশাপাশি বসে চা খেতে খেতে অনুরাধা জিজ্ঞেস করলো, এবার কী কী বই আনলে দেখি।

দুজনেই বইয়ের পোকা। বিশ্বজিৎ রাত কাটাবার জন্য নানা ধরনের বই কেনে। দু তিন মাস অন্তর কলকাতায় এসে তার পড়া বইগুলো সব অনুরাধাকে দিয়ে যায়।

এয়ার ব্যাগ থেকে আট দশখানা বই বার করে কোলের ওপর রেখে দেখতে লাগলো অনুরাধা। যে-সব বইয়ের মলাটে বন্দুক-পিস্তল বা নগ্ন মেয়েদের ছবি, সে বইগুলো অনুরাধা টান মেরে ফেলে দিতে লাগলো খাটের নিচে। বিশ্বজিতের বাছ-বিচার নেই, সে সব রকম বই-ই পড়ে, কিন্তু অনুরাধার রুচি বেশ উন্নত।

ব্যাগটার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে সেলোফেন মোড়া শার্ট বার করে বিশ্বজিৎ বললো, এটা তোমার বরের জন্য এনেছি। মাপটা ঠিকই হবে মনে হয়। দেবকুমার তো প্রায় আমারই সমান লম্বা?

নীল আর হালকা হলুদের চমৎকার স্ট্রাইপ দেওয়া শার্ট। রং দুটির মধ্যে বৃষ্টি শেষের বিকেলবেলার স্নিগ্ধ আভা রয়েছে।

শার্টটা উঁচু করে ধরে অনুরাধা বললো, মাপে তো ঠিকই হবে মনে হচ্ছে। কিন্তু এটা কী বলে আমি ওকে দেবো?

—কেন তুমি তোমার বরকে কখনো শার্ট কিনে দাও না? কাছাকাছি জন্মদিন-টন্মদিন বা বিবাহবার্ষিকী নেই?

শার্টটার ঘাড়ের কাছের লেবেল দেখে অনুরাধা বললো, ফরাসী দেশের। এরকম শার্ট আমি কলকাতায় পাবো কোথায়?

—কলকাতায় অনেক স্মাগল্ড জিনিস পাওয়া যায়।

—কবে প্যারিসে গিয়েছিলে?

—গত সপ্তাহে।

—এবার কজন গার্ল ফ্রেণ্ডের সঙ্গে দেখা হলো ওখানে।

—মাত্র দুজন।

—খুব হুল্লোড় হয়েছে?

—একটা রাতও ঘুমোতে পারিনি। একটি মেয়ের গাড়ি ছিল, তার সঙ্গে এক রাত্তিরে চলে গেলাম রিভিয়িরার দিকে।

—সেইজন্যই চোখের নিচে কালি—বিচ্ছিরি চেহারা হয়েছে তোমার—আর এরকম উড়নচণ্ডী হয়ে কতদিন চলবে!

—পাইলট হয়েছি, উড়নচণ্ডী হবো না? কলকাতায় কয়েকদিন ঘুমিয়েই দেখবি চেহারা ঠিক করে ফেলবো।

চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি সিগারেট ধরালো বিশ্বজিৎ, তারপর অনুরাধার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে বললো, আয় খুকুমণি, ঘণ্টা দুএক দুজনে ঘুমিয়ে নিই। দেন এগেইন উই শ্যাল মেক লাভ।

—আমার এখন ঘুমোবার সময় নেই, অনেক কাজ আছে।

উঠে গিয়ে বেতের ঝুড়ি থেকে ময়লা জামা-কাপড়গুলো নিয়ে অনুরাধা বাথরুমে ঢুকে পড়লো। কল খুলে বালতির মধ্যে ফেলে দিলে সেগুলো। বাথরুমের তাকে অনেকদিন আগেকার একটা গুঁড়ো সাবানের প্যাকেট রয়েছে।

—খুকুমণি, তুই কি আমার জামা-কাপড় কাচতে বসলি নাকি এখন?

—হ্যাঁরে খোকা। গেঞ্জিগুলো তো সব ময়লা, আর একটাও পরিষ্কার নেই দেখলাম আলমারিতে। আজ বিকেলে পরবি কি?

—দুপুরে বেরিয়ে গিয়ে কয়েকটা গেঞ্জি কিনে নিলেই তো হবে।

—এগুলো তা বলে কাচতে হবে না?

—বাড়িতে তোর বরের জামা-কাপড়গুলো কি তুই কাচিস?

—না। লোক আছে।

বিশ্বজিৎ হোহো করে হেসে উঠলো। তার হাসির মধ্যে একটা নির্মল স্বচ্ছতা আছে। যেন তার জীবনে হাসি ও আনন্দ ছাড়া আর কিছু নেই।

বিশ্বজিৎ তড়াক করে খাট ছেড়ে লাফিয়ে এসে বাথরুমে ঢুকেই খুলে দিল শাওয়ারটা। অনুরাধা ত্রস্তে সরে গিয়ে বললো, আমার শাড়ি-টাড়ি সব ভিজে গেল! তোকে এবার আমি মারবো।

বিশ্বজিৎ দেওয়ালে হেলান দিয়ে বললো, মনে আছে সেই বৃষ্টির দিনটার কথা।

মাত্র দু বছর আগে, অনুরাধার মনে থাকবে না?

অনুরাধার শাড়িটা নাইলনের। ভিজে গেলেও একটু মেলে দিলেই শুকিয়ে যাবে।

তুই সর এখান থেকে। আমি শাড়ি ছাড়বো।

একটু আগে ওরা এক খাটে শুয়ে ছিল নগ্ন হয়ে।

বিশ্বজিৎ অনুরাধার কথা গ্রাহ্য না করে ঈষৎ গাঢ় স্বরে বললো, সেদিন ছিল একুশে এপ্রিল, প্রচণ্ড কালবৈশাখীর ঝড় আর তারপর, অসম্ভব বৃষ্টি। আমার জীবনে বৃষ্টির একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। তোর কথা ভাবলেই আমার চোখে বৃষ্টির ছবি ভেসে ওঠে।

একুশে এপ্রিল, হ্যাঁ, অনুরাধারও মনে আছে তারিখটা।

বিশ্বজিতের পাশ দিয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে অনুরাধা ঘরের মধ্যে এসে খুলে ফেললো শাড়িটা। চেয়ার আর টেবিলের ওপর সেটা লম্বা করে মেলে দিয়ে পাখাটা জোর করে দিল। তারপর একটা বই খুলে বসলো খাটে।

বাথরুমের দেওয়ালে হেলান দিয়েই বিশ্বজিৎ সিগারেট টানতে টানতে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল অনুরাধার দিকে।

সেদিন ছিল একুশে এপ্রিল। দেবকুমার অফিসের কাজে বোম্বাই যাবে. এয়ারপোর্টে ওকে তুলে দিতে গিয়েছিল অনুরাধা। দেবকুমারের প্লেন ছেড়ে যাবার পর অনুরাধা ট্যাক্সির জন্য দাঁড়িয়েছিল, তার পাশ দিয়েই দুজন বিদেশিনী এয়ার হস্টেসের সঙ্গে হাঁটছিল বিশ্বজিৎ, তাকেও মনে হচ্ছিল কোনো বিদেশীই।

সে হঠাৎ ফিরে এসে অনুরাধার সামনে দাঁড়িয়ে বললো, অনুরাধা ভুল করিনি নিশ্চয়ই?

অনুরাধা চোখ তুলে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে বললো. নান্টু?

কতদিন পর দেখা! অন্তত পনেরো বছর! শেষ যখন দেখা হয়েছিল, তখন অনুরাধা বারো তের বছর বয়সিনী ফ্রক পরা এক বালিকা আর নান্টু অর্থাৎ বিশ্বজিৎ চোদ্দ পনেরো বছরের সদ্য গোঁফের রেখা ওঠা এক কিশোর। বিশ্বজিৎ তখন বেশ রোগা, হাফ প্যান্টের নিচে বেরিয়ে থাকা বেয়াড়া লম্বা ঠ্যাং আর বাবা মারা যাবার পর মাথা ন্যাড়া করেছিল বিশ্বজিৎ, তার সেই ন্যাড়া মাথার ছবিটাই মনে ছিল অনুরাধার। তবু চিনতে এক মুহূর্ত দেরি হলো না।

কত বদলে গেছে বিশ্বজিৎ। দু কান ঢাকা ঘাড় পর্যন্ত সতেজ কালো চুল, সাদা প্যান্ট শার্টে তার ফর্সা মুখখানা খুব চকচকে ও মসৃণ মনে হয়। অনেকটা যেন টনি পারকিন্স-এর মতন লাগে।

—তোমার বিয়ে হয়ে গেছে? কবে হলো। একটা খবরও দিলে না।

পনেরো বছরের মধ্যে কোনো যোগাযোগ ছিল না, তাকে বিয়ের খবর দেবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। নিউ আলিপুরের একেবারে পাশাপাশি দুটি বাড়িতে থাকতো ওরা। অনুরাধারা চার ভাই বোন আর বিশ্বজিৎরা পাঁচ এই নজনে মিলে ছিল একটা খেলার টিম। অনুরাধা তার ছ বছর বয়েস থেকে থাকতো নিউ আলিপুরে। সেই সময় থেকে বিশ্বজিৎদের চেনে। তখন তার নাম খুকু আর বিশ্বজিতের নাম নাণ্টু।

—তোমার গাড়ি আছে, না ট্যাক্সিতে যাবে?

বিশ্বজিৎ গিয়ে এয়ার হস্টেস দুজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসে অনুরাধার সঙ্গে এক ট্যাক্সিতে উঠেছিল। অনুরাধা একটুও দ্বিধা করেনি। বিশ্বজিৎ এখন একটা লম্বা চওড়া পরপুরুষ হয়ে গেলেও আসলে তো তার ছেলেবেলার খেলার সঙ্গী।

আকাশ মিশমিশে কালো, বৃষ্টি পড়েছিল টিপটিপ করে। একটু পরেই ঝড় উঠলো। দু বছর আগের সেই বিখ্যাত ঝড়, যাতে কলকাতার অন্তত পঞ্চাশটি গাছ ভেঙে পড়েছিল রাস্তায় এবং ময়দানে।

বাচ্চাদের সঙ্গে ব্যাডমিণ্টন খেলতে খেলতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন বিশ্বজিতের বাবা। দু ঘণ্টার মধ্যে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পরই সংসারটা ভেঙে গেল। বিশ্বজিতের বড়দা তখন সবে মাত্র এঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছে, প্রথম চাকরি পেল হায়দ্রাবাদে। এক বছর বাদে পুরো পরিবারটাই চলে গেল সেখানে। মনে আছে, সেদিন খুব কেঁদেছিল অনুরাধা। বিশ্বজিতের জন্য নয়, তার ঠিক পরের বোন মণিদীপা ছিল অনুরাধার প্রাণের বন্ধু। হায়দ্রাবাদ বড় বেশী দূর। প্রথম প্রথম ঘন ঘন চিঠি, তারপর প্রতি বছর বিজয়ার শুভেচ্ছা,

আস্তে আস্তে সব সম্পর্ক মুছে গেল একদিন।

ভি আই পি রোড ছাড়াতে না ছাড়াতেই রাস্তায় হাঁটু জল। গাছ পড়ে মৌলালির কাছে রাস্তা বন্ধ। ওদের কিছুই খেয়াল নেই। প্রাথমিক আড়ষ্টতা কেটে যেতেই দুজনে ছেলেবেলার গল্পে মশগুল হয়ে গেছে। কুড়ি পঁচিশ বছর আগেকার ঘটনা, সেই সময়কার মানুষদের কথা বলাবলি করে দুজনেই খুব হাসছে যেন সেই তখনকার দুই কিশোর-কিশোরী।

—তোরা এখনো সেই নিউ আলিপুরেই থাকিস? চল, পৌঁছে দিচ্ছি।

নিউ আলিপুরে দুটি পরিবারই ছিল ভাড়াটে। অনুরাধার বাবা এখন বেহালায় বাড়ি করেছেন। অনুরাধার বিয়ে হয়েছে শ্যামবাজারে, কিন্তু মাত্র তিন মাস আগে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে এসে অনুরাধারা আলাদা ফ্ল্যাট নিয়েছে ল্যান্সডাউন রোডে।

পার্ক স্ট্রীটে ঢুকে একেবারেই থেমে গেল ট্যাক্সিটা। ভেতরে জল ঢুকতে লাগলো হুড়হুড় করে। রাস্তার এখানে সেখানে ছড়ানো অচল গাড়ি। আধ ঘণ্টা সেই থেমে থাকা ট্যাক্সিতে বসেই গল্প করতে লাগলো ওরা। তারপর এক সময় খেয়াল হলো, এ বৃষ্টি আর থামবে না। সেদিন মহা প্লাবনে পৃথিবী ভেসে যাবে।

ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে অনুরাধাকে নিয়ে পথে নেমে পড়েছিল বিশ্বজিৎ। তখনও তুমুল বৃষ্টি। সপসপে ভেজা অবস্থায় গাড়ি বারান্দার তলায় আশ্রয় নেবার কোনো মানে হয় না। ওরা উরু পর্যন্ত ভেজানো জল ঠেলে হাঁটতে লাগলো। ঠিক কিশোর বয়েসের মতন। সব কিছুই দারুণ মজার লাগছে।

—কাছেই আমার ফ্ল্যাট। সেখানে যাবি খুকু?

অনুরাধার খুব একটা তাড়া নেই। তিন মাস আগে হলেও শ্বশুর-শাশুড়ির কথা চিন্তা করে যে-কোন ভাবেই হোক ফিরতে হতো বাড়িতে। কিংবা এরকমভাবে একলা একলা এয়ার পোর্টে যেতেই পারতো না। এখন নিজের ফ্ল্যাটে অনুরাধা স্বাধীন। দেবকুমারও নেই

কেউ তার জন্য চিন্তা করবে না। মেয়েকে সকালবেলা অনুরাধার মা এসে নিয়ে গেছেন। আজ রাত্তিরে না নিয়ে এলেও ক্ষতি নেই।

বাড়ির গেটের কাছে এসে অনুরাধা বলেছিল, থাক, আমি বরং বাড়ি যাই। রিক্‌শা পেয়ে যাবো।

বিশ্বজিৎ অবাক হয়ে বলেছিল, কেন? এই তো বললি, বাড়িতে কেউ নেই। আমার এখানে একটু বসে যা। খানিকটা গরম জল আর ব্র্যাণ্ডি খেলে আর ঠাণ্ডা লাগবে না। আমি একা থাকি, আর তো কেউ নেই আমার এখানে।

যেন এটাই সবচেয়ে স্বাভাবিক ব্যবস্থা। এইভাবে বিশ্বজিৎ অনুরাধাকে নিয়ে এলো তার ফ্ল্যাটে। শাড়ি-টাড়ি তো দিতে পারবে না, তবে বিশ্বজিতের প্যাণ্ট শার্ট পরে নিতে পারে অনুরাধা।

তা অবশ্য পরেনি অনুরাধা. তোয়ালে দিয়ে মাথাটা শুধু মুছে ভিজে শাড়ি পরেই বসলো সেখানে। বিশ্বজিতের শত অনুরোধও সে শুনলো না।

—তুমি এখানে এরকম একটা একা ফ্ল্যাটে থাকো?

—থাকি আর কতদিন? এই তো ঠিক দেড় মাস পরে এলাম। আবার কালই চলে যাবো।

অনুরাধা ব্র্যাণ্ডি খেতেও আপত্তি জানিয়েছিল। সেদিন বিশ্বজিৎই বানিয়ে ছিল কফি।

না। সেদিন একবারও চুম্বনের চেষ্টা করেনি পর্যন্ত বিশ্বজিৎ। ঘণ্টা দুএক বিভোরভাবে গল্প করবার পর, বৃষ্টি থামলে, সে অনুরাধাকে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল তার ফ্ল্যাটে।

সে ব্যাপারটা ঘটেছিল প্রায় ছ'মাস পরে।

পরের বার এসে সে সোজা উপস্থিত হয়েছিল অনুরাধাদের ফ্ল্যাটে। দেবকুমারের সঙ্গে আলাপ হলো। পার্ক স্ট্রিটের এক হোটেলে ওদের খাওয়াতে এনেছিল বিশ্বজিৎ। পরের দিন দুপুরে অনুরাধাদের বাড়িতে সে দুপুরে নেমন্তন্ন খেল।

কিন্তু অনুরাধা আর বিশ্বজিতের গল্পের মাঝখানে দেবকুমারকে

চুপ করে থাকতে হয়। তখন দেবকুমার যেন বাইরের লোক। ওদের শৈশব কৈশোরের জগতে তো দেবকুমার ছিল না। যে ঘটনার উল্লেখে বা যে ছোট কাকা বা সেজো মামার কোনো বাতিকের কথা তুলে বিশ্বজিৎ আর অনুরাধা হাসাহাসি করে, সে সব কিছুই দেবকুমারের কাছে তেমন হাস্য উদ্রেককর মনে হয় না। তার শৈশব কৈশোর ছিল অন্যরকম।

এটা বুঝতে পেরেই বিশ্বজিৎ শৈশব প্রসঙ্গে ইচ্ছে করে এড়িয়ে এমন কোনো কথা তোলে যাতে তিনজনেরই অংশগ্রহণ করার সুবিধে হয়। তবু হঠাৎ হঠাৎ ওরা ফিরে যায় শৈশবের দিনে। বিশ্বজিৎ যেন অনুরাধাকে সেই ছেলেবেলার জগতেই শুধু খুঁজে পায়।

দেবকুমার অতিশয় ভদ্র, সে তার স্ত্রীর বাল্যবন্ধুর সঙ্গে কক্ষনো একটুও অসমীচীন ব্যবহার করে নি। তবে ভেতরে ভেতরে সে যেন একটু হাঁপিয়ে উঠেছিল। ওদের দু-জনকে আলাদা গল্প করতে দিয়ে সে অন্য কোথাও থাকতে পারলেই যেন বেশী স্বস্তি পেত। দেবকুমার নিজে খুব আলাপী নয়, একজন আন্তর্জাতিক পাইলটের সঙ্গে গল্প করার মতন খুব বেশী বিষয় তার জানা নেই।

বিশ্বজিৎ অনুরাধার স্বামীর সামনে কক্ষনো তাকে তুই বলেনি।

তেহরান থেকে বিশ্বজিৎ চিঠি লিখেছিল একবার যে আগামী বুধবার সে কলকাতায় আসছে, দমদম থেকে সোজা সে দেবকুমারদের বাড়িতে চলে আসবে রাত আটটার মধ্যে। সে আলোচালের ফেনভাত, একটু ঘি, আলুসেদ্ধ আর কুচো চিংড়ি ভাজা খেতে চায়। অনেকদিন সে এইগুলো খায়নি। মাংস টাংস কিছু যেন না করা হয়।

পোস্টকার্ডখানা সে লিখেছিল দেবকুমার আর অনুরাধাকে যুগ্ম-ভাবে সম্বোধন করে।

সেই বুধবার বুনবুনকে ঘুম পাড়িয়ে ওরা স্বামী-স্ত্রী অপেক্ষা করতে লাগলো। ফেনভাত রান্না হয়ে গেছে, কুচো চিংড়িগুলোকে নুন হলুদ মাখিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে, বিশ্বজিৎ এলেই চটপট ভেজে ফেলা হবে।

রাত এগারোটার সময় দেবকুমার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, আমায় আবার কাল সকালেই ট্যুরে বেরুতে হবে।

অনুরাধা বললো, আজ আর ও আসবে না মনে হচ্ছে। তুমি খেয়ে নাও বরং।

দেবকুমার তার স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বললো, ইণ্টারন্যাশনাল প্লেনগুলো অনেক সময় দশ বারো ঘণ্টাও লেট থাকে।

দেবকুমারকে পরিবেশন করার একটু পরে অনুরাধা নিজেও খেয়ে নিয়েছিল। তারপর বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ গল্প হলো দুজনের। বিশ্বজিতের প্রসঙ্গ একবারও এলো না। অফিসের একটা সংকট নিয়ে দেবকুমার একটু চিন্তিত ছিল, অনুরাধাকে সব খুলে বললো। কারুকে একটু বলতে পারলেই মনটা হালকা লাগে। অফিসের কোন কোন লোক দেবকুমারকে পছন্দ করে কিংবা করে না, সে সম্পর্কে অনুরাধার বেশ পরিষ্কার একটা ধারনা আছে। অনেক সময় সে দেবকুমারের ভুল ভাঙিয়ে দেয়।

পরদিন সকাল দশটা আন্দাজ অনুরাধা চলে এসেছিল বিশ্বজিতের ফ্ল্যাটে। বিশ্বজিৎ এতই অনিয়মিত ভাবে কলকাতায় আসে যে তার এই ফ্ল্যাটে কোনো কাজের লোক রাখার প্রশ্নই ওঠে না। টুকিটাকি ছোটখাটো, কাজ সে বাড়ির দারোয়ান বা লিফটম্যানদের দিয়েই করিয়ে নেয়।

বেল টিপতেই বিশ্বজিৎ নিজেই দরজা খুলে দিল। চোখ দুটি অসম্ভব লাল, চুল অবিন্যস্ত, সে পরে আছে খুবই ছোট একটি হাফ-প্যাণ্ট যার নাম শর্টস। দারুণ গুমোটে কলকাতার সবাই সেদিন সকাল থেকেই বিনবিন করে ঘামছে। শুধু বিশ্বজিতেরই কপালে বা নগ্ন বুকে কোনো ঘামের চিহ্ন নেই।

সে বললো, আমি খুব আশা করেছিলুম তুই একবার খোঁজ নিতে আসবি, আয়—

খানিকটা টলতে টলতেই গিয়ে বিশ্বজিৎ ধুপ করে বিছানায় শুয়ে পড়লো।

—কাল এলে না কেন? ও কতক্ষণ অপেক্ষা করে বসেছিল তোমার জন্য।

—আমি দুঃখিত। পরে একদিন দেবকুমারবাবুর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবো।

—চিঠি, লিখেও এলে না কেন? প্লেন লেট ছিল?

—ছিল, তবে খুব বেশী না। দশটার মধ্যে দমদম পৌঁছে গিয়েছিলাম।

—দশটা? আমরা সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত তোমার জন্য না খেয়ে বসেছিলাম।

—কী করবো। সাঙ্ঘাতিক জ্বর এসে গেল। এয়ার ক্রাফটের মধ্যে থাকতে থাকতেই হঠাৎ ধুম জ্বর। সেকথা কারুকে জানাতেও পারি না। বললেই এয়ারপোর্টে হয়তো আমাকে কোয়ারেন্টাইনে রেখে দিত। দমদমে পৌঁছবার পর শরীরে অসহ্য ব্যথা, মাথা তুলতে পারছি না, তখন আর ঐ অবস্থায় তোদের বাড়ি যাওয়া যায় না। তোদের বাড়িতে টেলিফোনও নেই, একটা টেলিফোন আনিস না কেন?

—জ্বর হয়েছিল? মিথ্যে কথা। আসলে খুব নেশা করে ফেলেছিলে তাই না? চোখ দুটো অসম্ভব লাল রয়েছে এখনো।

—নেশা? তোর হাতটা দে।

বিশ্বজিৎ নিজেই, অনুরাধার হাতটা টেনে নিয়ে রাখলো নিজের কপালে। অনুরাধার হাতটা ছ্যাঁত করে উঠলো। বিশ্বজিতের কপাল থেকে কেন ধোঁয়া বেরুচ্ছে না, সেটাই আশ্চর্যের কথা।

অসুস্থ মানুষের প্রতি মেয়েদের চিরকালের দুর্বলতা।

তাছাড়া বিশ্বজিৎ নির্বান্ধব, নিরাত্মীয় অবস্থায় একটা ফ্ল্যাটে অসুস্থ হয়ে শুয়ে আছে, সে অজ্ঞান হয়ে থাকলেও কেউ তার খোঁজ নিতে আসবে না, এই চিন্তাই অনুরাধাকে বিহ্বল করে দেয়।

—ডাক্তার দেখাওনি?

টেবিলের ওপর জড়ো করা একগাদা ওষুধপত্রের দিকে আঙুল দেখিয়ে বিশ্বজিৎ বললো, এসব ছোটখাটো অসুখে আমরা নিজেরাই

ডাক্তারি করি।

—ছোটখাটো অসুখ মানে? হঠাৎ এত জ্বর হবে কেন?

—হয়।

বলেই মুচকি হেসে বিশ্বজিৎ আবার বললো, আমার এক বন্ধু গামাল, রাশিয়ায় গিয়ে এমন জ্বর বাধালো যে তিন দিনের মধ্যেই মরে গেল······ব্রেন ফীভার······চিকিৎসারও সুযোগ থাকে না।

হাসিটা আরও প্রসারিত করে বিশ্বজিৎ এর পর জানালো, আমি পরশুই মস্কো গিয়েছিলাম।

—ছ্যাখো নান্টু। এসব ইয়ার্কি আমার ভালো লাগে না।

সেই জ্বরের মধ্যেই বিশ্বজিৎ একটা সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করতেই অনুরাধা সেটা কেড়ে নিল জোর করে। এ ফ্ল্যাটে এক টুকরো ন্যাকড়া পাবার কোনো উপায় নেই বলে অনুরাধা নিজেরই রুমাল ছিঁড়ে ফেলে জলে ভিজিয়ে এনে বিশ্বজিতের কপালে জলপটি লাগিয়ে দিল। তারপর বসলো তার শিয়রের পাশে।

—তুই খুব দামী পারফিউম ব্যবহার করিস, নারে খুকু?

—এই একটাই আমার বিলাসিতা।

—কেন, শাড়ি গয়না?

—আমাকে কখনো গয়না পরতে দেখেছো, সাধারণ শাড়িতেই আমার বেশ চলে যায়। কিন্তু ভালো পারফিউম ব্যবহার করলে আমার মন ভালো থাকে।

—এখন মন ভালো আছে?

—ছিল, কিন্তু তোমাকে আমি এই জ্বরের মধ্যে ফেলে যাবো কী করে বলো তো? সারাদিন চিন্তা থাকবে।

—তাহলে আজ সারাদিন থাক এখানে।

—আহা-হা! আমার যেন ঘর-সংসার নেই? মেয়েটা রয়েছে বাড়িতে।

নিজের অসুখ সম্পর্কে কোনো ভয় নেই বিশ্বজিতের। কিন্তু তার এই বাল্য-সঙ্গিনীর ব্যাকুলতা সে বেশ উপভোগ করে। সারা

বিশ্বের বিভিন্ন শহরে ঘুরে ঘুরে সে অনেক কিছু পেতে পারে কিন্তু এই জিনিসটি কোথাও পাবে না।

—তোর জন্য আমি খুব ভালো পারফিউম এনে দেবো।

—না।

—আনবো না ?

—না। সেই প্রথমবার তুমি আমাদের বাড়ি গিয়ে পারফিউম দিয়েছিলে। সেটা ওর সামনে দিয়েছিলে বলে আমি রিফিউজ করতে পারিনি। কিন্তু এসব আমার পছন্দ নয়। তুমি আমার জন্য কোনো জিনিস আনবে না।

—আচ্ছা বেশ আনবো না কিন্তু কেন সেটা জানতে পারি কি ?

—কেউ কিছু দিলেই তার প্রতিদান দিতে হয়। না হলে আমার দারুণ অস্বস্তি লাগে।

যেন এটা একটা খুব মজার কথা, এইভাবে হোহো করে হেসে উঠলো বিশ্বজিৎ। তারপর পর পর দুটি, না তিনটি সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী কথা বললো।

প্রথম ঃ একটা সিগারেট অন্তত খাই খুকু ? সিগারেট না খেয়ে আর পারছি না।

অনুরাধা কড়াভাবে বললো, না।

দ্বিতীয় ঃ আমার মাথা ঘুরছে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে চোখে ভুল দেখছি। এখনো যেন আমি এয়ার ক্র্যাফটের মধ্যে বসে আছি।

অনুরাধা বিশ্বজিতের চুলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে দিয়ে বললো, আমি মাথা টিপে দিচ্ছি।

তৃতীয় ঃ খুকু, তোর মনে আছে ? আমার বড়দির বিয়ের দিন ···তুই কী দারুণ সেজেছিলি। একটা লাল রঙের স্কার্ট পরেছিলি। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি···বিয়ের দিন আমরা ব্যাংকের পাশের নতুন বাড়িটা ভাড়া নিয়েছিলাম, সেই জন্য আমাদের বাড়িতে কেউ সেদিন ছিল না···মা আমাকে বললেন, কয়েকটা মাটির খুরি নিয়ে আসতে—আমাদের ছাদ থেকে···তুই এসেছিলি আমার সঙ্গে····

আমরা দেখলাম ছাদে অন্ধকারে নির্মলদা ফুলুদিকে চুমু খাচ্ছেন··· আমাদের দেখতে পেয়েই ওঁরা পালিয়ে গেলেন···তখন আমাদের কী হাসি···তখন চুমু জিনিসটা কী আমরা ঠিক জানতাম না, শুধু এইটুকু ধারণা ছিল, ওটা একটা অসভ্য ব্যাপার···তারপর অনেক রাত্তিরে অনেকেই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে আমিও নির্মলদার মতন তোকে চুমু খেতে চেয়েছিলাম···তুই খুব না না করেছিলি · কিন্তু তোর সঙ্গে আমার প্রতিজ্ঞা ছিল তুই আমার কোনো কথায় না বলতে পারবি না, তুই শেষকালে বলেছিলি আচ্ছা, ঠিক একবার কিন্তু · আমি তোকে চুমু খেতে গেলাম···তুই তখন এত ছোট যে কিছুই জানতিস না যে খুলতে হয়···তুই ঠোঁটে ঠোঁট চেপেছিলি ··আমি বলছিলাম, কই কই হচ্ছে না···এমন সময় মনে আছে তোর কার যেন পায়ের শব্দ···আমরা ভেবেছিলাম কেউ আসছে আমি দৌড়ে গিয়ে লুকোলাম ট্যাঙ্কের পাশে—তুই নিচে চলে গেলি · আসলে কেউ আসছিল না, একটা ছেঁড়া ঠোঙা হাওয়ায় উড়ছিল। তাতেই আমরা ভয় পেয়ে···

অনুরাধার সেদিনের প্রতিটি মুহূর্তই সমস্ত শব্দ বর্ণ মিলিয়ে মনে আছে। এসব কথা কেউ সারা জীবনে ভোলে? তবু সে চুপ করে রইলো।

—এত বছর কেটে গেল, তারপর অনেক মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, কত জনকে চুমু খেয়েছি কিন্তু সেদিনের সেই অসমাপ্ত চুমু এখনো মনে পড়ে, আব কষ্ট হয়, মনে হয় সারা জীবনে কিছুই পাইনি—সেদিনের সেই চুমুটা তুই আমায় দিবি?

বিশ্বজিতের মাথা থেকে হাত তুলে নিয়ে অনুরাধা বললো, এটা বুঝি সিডিউস করার একটা নতুন কায়দা?

লাল চোখ মেলে কঠিন গলায় বিশ্বজিৎ জিজ্ঞেস করলো, আমায় দিবি না?

বিশ্বজিতের শিয়র ছেড়ে উঠে এসে অনুরাধা বললো. কলকাতায় তোমার কোনো চেনা ডাক্তার নেই?

—আগে আমার কথার উত্তর দে।

—ছেলেমানুষী করো না, নান্টু। তখনকার কথা আর এখনকার কথা অনেক আলাদা।

পাশ ফিরে শুয়ে সে চোখ বুজে রইলো।

—তুমি দুপুরে কী খাবে?

কোনো উত্তর নেই।

যেন কোনো শিশু অভিমান করেছে। অসুখে ভুগলে কোনো কোনো বাচ্চা ছেলে নানা রকম অন্যায় আবদার করে। যেন বিশ্বজিৎ কাঁচা লঙ্কা আর নুন দিয়ে মাখা কাঁচা আম খেতে চাইছে। দেওয়া উচিত নয়, আবার এক আধ টুকরো দিলেও ক্ষতি নেই খুব।

টেবিলের ওপর ওষুধের স্ট্রিপ ও ট্যাবলেটের শিশিগুলো নাড়া-চাড়া করতে করতে অনুরাধা আবার জিজ্ঞেস করলো, তুমি এখন কোনো ওষুধ খাবে? দেবো আমি?

তবু কোনো উত্তর নেই।

এবার সমস্ত শরীরময় সুগন্ধ নিয়ে অনুরাধা এসে আবার বসলো বিশ্বজিতের শিয়রের পাশে। মুখটা ঝুঁকিয়ে বললো, তুই চোখ বুজে থাকবি, আমি শুধু একবার···

বিশ্বজিতের ঠোঁটে নিজের ঠোঁটটা ছুঁইয়েই অনুরাধা মুখটা তুলে আনতে যাচ্ছিল, বিশ্বজিৎ হাত বাড়িয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরলো। এ ছেলের যেন কাঁচা আম মাখার প্রতি সাঙ্ঘাতিক লোভ। অথবা মানুষের এমনই তৃষ্ণা যে একশো পাঁচ ডিগ্রি জ্বরেও তার নিবৃত্তি হয় না।

চুম্বনটি দীর্ঘ দীর্ঘ দীর্ঘ দীর্ঘস্থায়ী হলো, যেন আর শেষই নেই। যেন পনেরো কুড়ি বছর ধরে জমিয়ে রাখা বাসনা এখন দাবি মিটিয়ে নিচ্ছে। অনুরাধার শরীর যেন মিশে গেছে বিশ্বজিতের মধ্যে।

তারপর মুখ তুলে অনুরাধা বিশ্বজিতের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো অনেকক্ষণ। তার মনের মধ্যে সমস্ত প্রতিরোধের বাঁধ ভেঙে গেছে।

পরবর্তী ব্যাপারটির জন্য একটিও বাক্য বিনিময়ের প্রয়োজন হলো না। কী শান্ত নরম সুন্দরভাবে বিশ্বজিৎ গ্রহণ করলো অনুরাধাকে। যেন একটি ফুলকে আদর করছে বিশ্বজিৎ একটিও পাপড়ি যেন খসে না যায়, একটুও যেন নখের আঁচড় না লাগে। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন স্বপ্নের মতন, অথচ কী অসম্ভব উন্মত্ততা, যেন দুই মিত্রপক্ষের হিংসাহীন এক চরম যুদ্ধ। অনুরাধার জীবনে যেন এমন আর কখনো ঘটেনি। এই প্রথম সে যেন জানলো, শরীরের আনন্দ কত তীব্র হতে পারে। যেন সর্বনাশের সীমারেখায় একেবারে হেলে থাকা।

নতুন টাকার মতন দুটি চকচকে নিরাবরণ শরীর কিছুক্ষণ শুয়ে রইলো পাশাপাশি।

এই সময়ই অনেক রকম অপরাধবোধ মাথার মধ্যে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে। অনুরাধা চোখ বুজে সেগুলোকে তাড়িয়ে দিতে চাইলো। এখন না, পরে একসময় বোঝা-পড়া করা যাবে। এখন ভালো লাগার অনুভূতি ও আবেশটুকু বড় একটি বাথটাব ভর্তি গোলাপজলের মধ্যে স্নান করার মতন, সে পুরোপুরি উপভোগ করতে চায়।

এবার একটা সিগারেট খাই, খুকু ? প্লীজ।

অনুরাধা নিজেই হাত বাড়িয়ে সিগারেট আর দেশলাইটা এনে দিল বিশ্বজিৎকে।

বিশ্বজিৎ একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো, তোকে একটা দেবো ? কখনো খাসনি ?

—দে।

এই প্রথম বিশ্বজিৎকে তুই বললো সে।

মিলনের মুহূর্তটিতে সে বুঝতে পেরেছিল যে সে বিশ্বজিতের অনেক কাছে চলে এসেছে। ছেলেবেলার বন্ধুকে এতদিন পরে ফিরে পেলেও কোথায় যেন একটু আড়ষ্টতা থেকেই গিয়েছিল। ছেলেবেলায় শরীর থাকে না। যৌবনে শরীরই একটা প্রধান বিষয়। শরীরের বাধা থাকলে অনেক মনের কথাই না বলা রয়ে যায়।

ছেলেবেলায় দুজনে দ্বিধাহীনভাবে কত রকম খেলা খেলেছে। এখন বড় বয়সে অন্য রকম খেলা যদিও, কিন্তু খেলার মধ্যে দ্বিধা রাখলে আর ছেলেবেলায় ফিরে যাওয়া যায় না কিছুতেই। অনুরাধা সেটা সেই মুহূর্তে টের পেয়েছিল।

দেবকুমারের সঙ্গে মাঝে মাঝে ঝগড়াঝাটি হলেও মনের খুব একটা গভীর জায়গায় দেবকুমারের জন্য একটা দুর্বলতা আছে অনুরাধার। দেবকুমার নির্ভরযোগ্য এবং অনুরাধাকে সে কখনো আঘাত দিতে চায় না। অনুরাধার জন্য সে অনেক কিছু ত্যাগ করেছে, এমন কি বাবা মাকেও। দেবকুমার আর বিশ্বজিতের যদি তুলনা করা যায় তাহলে স্বীকার করতেই হবে, মানুষ হিসেবে দেবকুমার অনেক বড়। তার তুলনায় বিশ্বজিৎ অনেকটা হালকা ধরনের। দেবকুমার এই পৃথিবীকে যাচাই করে নিরপেক্ষ চোখ দিয়ে। কিন্তু বিশ্বজিৎ রোমান্টিক এবং আবেগপ্রবণ। সবচেয়ে বড় কথা তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনুরাধার মধুর শৈশব কৈশোর। বিশ্বজিতের নিজস্ব দোষগুণেব চেয়েও বড় কথা সে, অনুরাধাকে উপহার দিতে পারে স্বপ্ন এবং স্মৃতি। দেবকুমার সেখানেই হেরে যায়।

পরে নিজের বাড়িতে অনেকবার একা একা চিন্তা করে দেখেছে অনুরাধা। সে কি পাপ করছে? তার আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শন পড়া মনে পাপ কথাটা তেমন গুরুত্ব পায় না। পাপ পুণ্য প্রভৃতি তো কয়েকটি যুগবাহিত সংস্কার মাত্র। আসল কথা হচ্ছে, নিজের বিবেকের কাছে কোনটা ভালো বা মন্দ অথবা ন্যায় বা অন্যায়। একজন বিবাহিতা নারীর অপর পুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংসর্গ করা অনুরাধার মতেও অন্যায়। কিন্তু কত বড় অন্যায়? দেবকুমার জানতে পারলে খুবই আঘাত পাবে। আর যদি জানতে না পারে?

যুক্তি দিয়ে অনুরাধা কিছুতেই নিজের এই কাজকে সমর্থন করতে পারে না। কিন্তু একটা অযৌক্তিক আবেগ তাকে বার বার বিশ্বজিতের কাছে টেনে নিয়ে যায়।

একবার সামান্য কোনো কারণে দেবকুমারের সঙ্গে তিক্ত ঝগড়া

হবার পর অনুরাধা বিশ্বজিতের কাছে গিয়ে বলেছিল, আমি আর বাড়ি ফিরবো না, আমি এখন থেকে তোর এই ফ্ল্যাটেই থাকবো।

সেদিন বিশ্বজিতের উত্তর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল অনুরাধা। বিশ্বজিৎ বলতে গেলে তাকে অপমানই করেছিল।

—খুকু, তুই যে এত বোকা, তা তো জানতুম না।

—এর মধ্যে বোকামির কী আছে? আমি আমার জীবনটা ইচ্ছে মতন চালাতে পারি না?

—হঠাৎ এক সকালবেলায় ঝগড়ায় কেউ নিজের জীবনটা বদলায় না। তাছাড়া তুই যদি আমার ওপর কোনো কারণে নির্ভর করতে চাস সেটা হবে তোর জীবনের পক্ষে একটা মারাত্মক ভুল। আমি তোর বন্ধু হতে পারি কিন্তু আমাকে তুই যদি অন্য কিছু হিসেবে পেতে চাস তা হলে দুদিন বাদেই তুই হতাশ হবি। দেবকুমারবাবুর তুলনায় আমি অনেক অনেক বেশী অপদার্থ। মাসের পর মাস আমার সঙ্গে তোর দেখা হবে না, অমুক দিন ফিরবো বলেও হয়তো ফিরবো না। আমার মতন মানুষের কক্ষনো কথার ঠিক থাকে না। তাছাড়া জানিস তো এ সেলার হ্যাজ আ ওয়াইফ ইন এভরি পোর্ট, আমরা আকাশের নাবিক আমাদেরও ঐ একই অবস্থা। তোকে তো লুকোইনি আমি যে পৃথিবীর অনেক শহরেই আমার বান্ধবী আছে।

—নান্টু, আমি তাহলে তোর অনেক বান্ধবীর মধ্যে একজন মাত্র?

—না। সেটাও ঠিক নয়। সবাই একদিকে, তুই একদিকে। তোর জায়গায় আমি অন্য কারুকে বসাতে পারবো না কিন্তু তুই আর আমি জীবনসঙ্গী হতে পারবো না।

—অর্থাৎ তুই কোনো রকম দায়িত্বই নিতে রাজি না!

—আমার পক্ষে সম্ভব না যে। আমরা প্রায় সর্বক্ষণ আকাশে থাকি। মাটির পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের যোগ কতটুকু। তুই যে-কোনো দিন আমার মৃত্যু সংবাদ পেতে পারিস। হঠাৎ একটা হাই-জ্যাকার গুলি চালিয়ে আমার মাথা ফুটো করে দিতে পারে। অথবা

সামান্য একটা মেকানিক্যাল ডিফেকটের জন্য প্লেনসুদ্ধু আছড়ে পড়তে পারি। এইসব ঝুঁকি আছে বলেই কোম্পানিগুলো আমাদের বেশী মাইনে দেয়, এত আরাম আর বিলাসিতার মধ্যে রাখে। সমাজের সঙ্গে আমাদের কোনো যোগ থাকে না। শুধু আমরা কেন প্রত্যেক দেশেরই আমি নেভি এয়ার ফোর্সে একগাদা মানুষ পোষা হয় এবং সাধারণ মানুষের সমাজের সঙ্গে তাদের কোনো যোগ রাখতে হয় না।

—তুই আমাকে বোকা ভেবেছিস? কোনো পাইলটের ঘর-সংসার নেই? তারা কেউ কোনো দায়িত্ব নেয় না?

নিতে পারে। সবাই একরকম হয় না ঠিকই। আমি বলছি, আমাদের প্রফেশানে জেনারালভাবে····

—আমার আজ মনটা খুব খারাপ। এসব কথা শুনতে আজ আমার একটুও ভালো লাগছে না।

—আহা হা কেন তোর মন খারাপ?

বিশ্বজিৎ এগিয়ে এসে অনুরাধাকে আদর করতে যেতেই অনুরাধা তার হাত সরিয়ে দিয়ে বলেছিল, না।

—কেন?

—আমি ভুল করেছি।

—আমার এখানে এসে? না, তুই ভুল করিসনি। আমরা বাঙালীরা বা রাদার ইণ্ডিয়ানরা যে কোনো কাজকেই সারা জীবনের ব্যাক গ্রাউণ্ডে দেখি। কিন্তু এই মুহূর্তের যে আনন্দ তারও যে একটা বিশাল মূল্য আছে, সেটা আমরা বুঝি না বা বুঝতে চাই না।

—তুই আজ খুব লেকচার দেবার মুডে আছিস, না রে নান্টু? আমার কিছু ভালো লাগছে না। কিছু না।

—দেবকুমারবাবুর সঙ্গে খুবই ঝগড়া হয়েছে? এক কাজ করা যাক না ওঁকে অফিস থেকে ধরে আনি, তারপর তিনজনে মিলে খানিকক্ষণ আড্ডা দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

অনুরাধা বিশ্বজিতের দিকে অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। তারপর বললো, যারা দায়িত্ব নিতে জানে না তারা এ জীবনের অনেক

কিছুই বোঝে না।

বিশ্বজিৎ সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিয়ে বললো, তা ঠিক।

অনুরাধা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমি আজ যাই।

বিশ্বজিৎ তাকে বাধা না দিয়ে বললো, বেশী মন খারাপ করে থাকিস না প্লীজ।

দরজার কাছে গিয়ে একবার ঘুরে দাঁড়িয়ে অনুরাধা বললো, তুই কি এইভাবেই জীবন কাটাবি ঠিক করেছিস?

—ঠিক কিছু করিনি, তবে ইচ্ছে আছে পাঁচ সাত বছরে বেশ কিছু টাকা জমিয়ে এ চাকরি ছেড়ে দেবো, তারপর গ্রামে কোথাও জমি কিনে আলু-বেগুনের ক্ষেত করবো। তখন শুধু মাটির ওপর পা দিয়ে হেঁটে বেড়াবো আর কোনোদিন আকাশে উড়বো না।

—আমি আর কোনোদিন আসবো না। তুই আমাকে আর কখনো ডাকিস না।

বিশ্বজিৎ অনুরাধার দু কাঁধ চেপে ধরে তার ডান কানের লতিতে নরম করে চুমু দিয়ে বললো, আমি ডাকবো না। তোর যদি ইচ্ছে না হয়, আসিস না। আমাকে যদি তোর ভালো না লাগে তা হলে আসিস না। আমি তোকে খুব ভালোবাসি রে খুকু। আমার মতন একজন দায়িত্বজ্ঞানহীন হালকা চরিত্রের মানুষের পক্ষে যতখানি ভালোবাসা সম্ভব, বোধহয় তার চেয়েও খানিকটা বেশী।

তবু অনুরাধা আসে। না এসে পারে না। এটা যেন তার ইচ্ছে অনিচ্ছে ন্যায় অন্যায় বোধের চেয়েও আলাদা কিছু। এর নাম মুক্তি।

॥ ৭ ॥

—স্যার আজ বাড়ি চলে যান। আজ আপনাদের ঢুকতে দেওয়া হবেনা।

প্রিয়নাথ থমকে দাঁড়ালেন। গেটের সামনে ছাত্ররা সব ভিড় করে আছে। আজ আবার কিসের যেন স্ট্রাইক।

এ রকম তো প্রায়ই একটা না একটা লেগে থাকে, তাই উপলক্ষ জানবার জন্য প্রিয়নাথ আগ্রহ বোধ করলেন না। ছাত্ররা যদি পড়া-শুনো করতে না চায় তাহলে থাক অশিক্ষিত নির্বোধ হয়ে। একসঙ্গে অনেক মানুষ মিললেই একটা অন্ধ শক্তি তৈরি হয়, তখন তারা যা আবদার করবে, তাই মেনে নিতে হবে। এমন কি পনেরো ষোলো বছর বয়েসী কুড়ি পঁচিশটা স্কুলের ছাত্রও এককাট্টা হলে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে ফেলতে পারে।

কয়েক বছর আগে কুড়ি পঁচিশটিও নয়, মাত্র সাত আটটি ছেলে এসেছিল এই স্কুলটায় আগুন ধরিয়ে দিতে। তখন কেউ তাদের বাধা দিতে সাহস পায়নি।

প্রিয়নাথ মনে মনে রিটায়ার করার দিন গুনছেন। পড়াতে তাঁর একটুও ভালো লাগে না আজকাল। পড়াবেন কাকে? আগে এক একটা ক্লাসে অন্তত দশ-বারোটি ছাত্র পাওয়া যেত যারা আগ্রহী, যারা টেক্‌সট বইয়ের জ্ঞানের চেয়েও বেশী কিছু জানতে চাইতো। আজকাল অধিকাংশ ক্লাসেই সে রকম ছেলে প্রায় একটিও খুঁজে পাওয়া যায় না। এক একটা সেকশনে সত্তর আশিটা ছেলে, তাদের মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে তারা মাস্টারমশাইয়ের অর্ধেক কথারই মানে বুঝতে পারে না। কেউ কিছু পড়ে না। এমন কি হাই বেঞ্চের আড়ালে লুকিয়ে গল্পের বইও পড়ে না কেউ।

একটু মেধাবী বা ভালো ছাত্ররা সব যায় আজকাল ইংরেজী স্কুলে। সামান্য অবস্থাপন্ন পরিবারের কেউ আর ছেলেদের পারতপক্ষে বাংলা স্কুলে পাঠায় না। এক সময় এই স্কুলেরই ছাত্র ম্যাট্রিকে ফার্স্ট হয়েছে তিনবার, স্কুল ফাইনালেও ছুবার। আর গত দশ বছরের মধ্যে স্ট্যাণ্ড করা তো দূরে থাকুক, একটি ছেলেও লেটার পর্যন্ত পায়নি।

একশো সাত বছরের পুরোনো স্কুল, কত ঐতিহ্য, এখন সেখানে বিদ্যাচর্চা বলতে কিছুই নেই। শুধু বছর বছর কিছু ছেলেকে কোনো-ক্রমে পাস করাবার চেষ্টা। পাস করাবার জন্যও অবশ্য আজকাল

পড়ানোর দরকার হয় না। পরীক্ষা মানেই তো টোকাটুকি।

ছেলেগুলোকেই বা দোষ দিয়ে কী হবে! ক্লাস থি্, ফোর, ফাইভের ছেলেগুলো এখনো কী সরল, সুন্দর প্রাণবন্ত। আগেকার দিনের শিশুদের সঙ্গে এখনকার দিনের শিশুদের তো কোনো তফাত নেই। কিন্তু একটু বড় হলেই ছেলেরা বড় কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি হয়। কেউ তাদের বলে না যে নিজের চিন্তা-ভাবনাকে উন্নত করার জন্য বিদ্যাচর্চার দরকার। সেভেন এইটের ছেলেরাই বুঝে যায় যে পড়াশুনো করতে হয় শুধু চাকরি পাবার জন্য। এবং সব কটা ডিগ্রি অর্জন করলেও চাকরি পাবার আশা নেই। সামনে সম্পূর্ণ অন্ধকার দেখেও কি এইসব ছেলেরা শান্ত, সুবোধ, বাধ্য হয়ে থাকতে পারে?

শ্রীকৃষ্ণন চেট্টির ফাঁসির প্রতিশোধ চাই। বিভিন্ন পোস্টারে এই কথাটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লেখা। প্রিয়নাথ ভুরু কুঁচকে রইলেন। শ্রীকৃষ্ণন চেট্টি কে? খবরের কাগজে এর সম্পর্কে কিছু দেখেছেন বলে তো মনে পড়ে না। অবশ্য আজকাল খবরের কাগজেও ওপর ওপর চোখ বুলিয়ে যান প্রিয়নাথ।

ফাঁসি? কে যেন বলেছিল, এ-দেশ থেকে ফাঁসি উঠে গেছে? ফাঁসির কথা শুনলেই পরাধীন আমলের বিপ্লবীদের কথা মনে পড়ে।

ছাত্ররা যখন খেপে উঠেছে তখন এই শ্রীকৃষ্ণন চেট্টি নিশ্চয়ই রাজনীতির লোক। তার ফাঁসি হলো কেন? গত ইলেকশানের পর সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের ছেড়ে দেবার কথা ছিল না?

প্রিয়নাথ এক পা এগিয়ে এসে গেট অবরোধকারী ছাত্রদের জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে, এর কোথায় ফাঁসি হয়েছে?

একজন ছাত্র বললো, কেরালায়, একজন বললো বাঙ্গালোর, আর একজন বললো, সাউথ ইণ্ডিয়া, আর একজন নেতা গোছের ছেলে অন্যদের ধমকে বললো, ধ্যাৎ তোরা কিছু জানিস না, শ্রীকৃষ্ণন চেট্টি অন্ধ্রের নকশাল নেতা।

তারপরই স্লোগান দিল, কমরেড শ্রীকৃষ্ণন চেট্টি—

অন্য সবাই চিৎকার করলো, জিন্দাবাদ!

একটু পরে আওয়াজ থামলে প্রিয়নাথ আবার জিজ্ঞেস করলেন, হেড মাস্টারমশাই ভেতরে গেছেন ?

—উনি সাড়ে ন'টার মধ্যে এসে ঢুকে পড়েছেন !

—আর গিরীনবাবু ? অ্যাসিসট্যান্ট হেড মাস্টারমশাই ?

—উনিও সেই একই সঙ্গে।

গিরীনবাবুর নাম উচ্চারণ করেই প্রিয়নাথ খানিকটা ঈর্ষা বোধ করলেন। প্রিয়নাথেরই অ্যাসিসট্যান্ট হেড মাস্টার হবার কথা একেবারে ঠিক হয়েছিল। স্কুলে ওঁর চেয়ে পুরোনো টিচার আর কেউ নেই। হঠাৎ গিরীনবাবুকে বাইরে থেকে নিয়ে আসা হলো।

খুব বড় রকমের মুরুব্বির জোর আছে গিরীনবাবুর। যাক এসব প্রিয়নাথ আর ভাবতে চান না। আর তো মাত্র বছর দেড়েক এই দিনগত পাপক্ষয় করে যেতে হবে।

—আর কোনো মাস্টারমশাই ভেতরে যাননি ?

—হ্যাঁ। স্যার, আরও পাঁচ ছ-জন স্যার কী করে যেন ঢুকে পড়েছেন, আমরা টের পাইনি।

একটুক্ষণ চুপ করে ছিলেন প্রিয়নাথ। তারপর বললেন, ছ্যাখ, তোরা ঢুকতে না দিলে তো আমি জোর করতে পারবো না। তবে হেড মাস্টারমশাই আর কয়েকজন যখন ভেতরে ঢুকলেন তখন আমি আজ খাতায় নাম সই না করলে আমার একদিনের মাইনে কাটা যাবে।

কে বলে ছাত্রদের মনে দয়া-মায়া নেই ? একটু বয়স্ক ছাত্ররা নিজেদের মধ্যে একটু আলোচনা করে নিয়ে বললো, দে গেট ছেড়ে দে, স্যারকে ঢুকতে দে ভেতরে।

প্রিয়নাথ ছেলেগুলির প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করলেন। একদিনের মাইনে কাটা গেলে বড় গায়ে লাগে।

হেড মাস্টার এবং অ্যাসিসট্যান্ট হেড মাস্টারের দুটি আলাদা ঘর। আর একটি ঘর টিচার্স রুম। ঐ অ্যাসিসট্যান্ট হেড মাস্টারের ছোট ঘরখানির প্রতি প্রিয়নাথের লোভ ছিল। তিনি একা থাকতে

ভালোবাসেন। মাইনে বা পদমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তেমন নয়। স্কুলে তাঁর নিজস্ব একটা আলাদা ঘরের জন্যেই প্রিয়নাথ অ্যাসিসট্যান্ট হেড মাস্টার হবার সম্ভাবনাতে দারুণ খুশী হয়ে উঠেছিলেন। যাক এ জীবনে তো অনেক কিছুই হলো না।

স্ট্রাইকের দিনে বয়স্ক শিক্ষকরা টিচার্স রুমে বসে বসে ঢোলেন কিংবা খবরের কাগজের প্রতিটি পৃষ্ঠার লাইন মুখস্থ করেন। দুটো আড়াইটে পর্যন্ত এ রকমভাবে কাটিয়ে দিলেই চলে। তারপর বেরিয়ে কেউ ইনসিওরেন্স অফিসে কেউ বা হায়ার সেকেণ্ডারি বোর্ডের অফিসে কিছু তদবির তদারকির কাজে যান।

অল্পবয়স্ক শিক্ষকেরা সর্বক্ষণ মেতে থাকেন তর্কে।

আজকাল নতুন শিক্ষকদের মধ্যে অন্তত শতকরা পঞ্চাশ ভাগই আসেন অন্য কোনো চাকরি না পেয়ে অগত্যা। তাঁদের মুখে চোখে থাকে সেই তিক্ততা। ওঁদেরই কোনো কোনো বন্ধু বা ক্লাস ফ্রেণ্ড একই রকম ডিগ্রি নিয়ে ব্যাঙ্কে বা রেলে বা ইনসিওরেন্স কোম্পানিতে দ্বিগুণ মাইনে পাচ্ছেন, এর জ্বালা কিছুতেই ভোলা যায় না। এরা প্রায় সবাই রাজনৈতিক দলাদলিতে খুব উৎসাহী।

টিচার্স রুমে লেখাপড়ার কথা ওঠে কদাচিৎ। প্রায় সর্বক্ষণ সেখানে রাজনৈতিক তর্কের ঝড় বইতে থাকে। যে দু-একজন লাজুক স্বভাবের শিক্ষক বেশী পড়ুয়া ধরনের বা কবিতা-টবিতা লেখার অভ্যেস আছে তাঁরা ঐ রাজনৈতিক পন্থীদের বিদ্রূপের পাত্র হন।

প্রত্যেকের জন্য মোটামুটি একটি নির্দিষ্ট জায়গা আছে। প্রিয়নাথ এসে নিজের জায়গায় বসলেন। খবরের কাগজ দুটোই বেদখল হয়ে আছে বলে তিনি বাধ্য হয়েই শুনতে লাগলেন তাঁর তরুণ সহকর্মীদের উচ্চগ্রাম আলোচনা।

ব্যাপারটা এবার অনেকটা পরিষ্কার হলো। শ্রীকৃষ্ণন চেট্টি তামিলনাড়ুর গড্ডোলু জেলার একজন নকশাল নেতা। দাস শ্রমিক-প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন। কয়েক বছর আগে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন।

দাস শ্রমিকপ্রথা যে এদেশে এখনো আছে, একথা শুনে প্রিয়নাথ অবাক হলেন না। এই প্রথা আগেও ছিল, এখনো আছে, আরও কতদিন থাকবে কে জানে! বিভিন্ন নামান্তরে পৃথিবীর সব দেশেই এরকম চলছে। এই যে ছেলেরা অন্য কোনো চাকরি না পেয়ে অনিচ্ছার সঙ্গে বাধ্য হয়ে মাস্টারি করছে, এটাও এক ধরনের দাস শ্রমিকপ্রথা নয়?

কিন্তু দেশের সব নেতাই তো বলেন যে দাস শ্রমিকপ্রথা উঠে যাওয়া উচিত। তা হলে শ্রীকৃষ্ণন চেট্টি কী দোষ করলেন? উনি দুএকটা খুন-টুন করেছেন কিনা তা অবশ্য ওঁদের কথা থেকে জানা যাচ্ছে না। এক বা একাধিক মানুষ না মেরে কে আবার কবে এ দেশের নেতা হয়েছেন? সবাই নিজের হাতে মারেন না, তাঁদের নির্দেশে দলের ছেলেরা মারে অথবা কোনো একটা নীতির গোল-মালের জন্য কয়েক হাজার লোক মরে যায়। আইন আদালত সব সময়ই নিরীহ খুনীদের শাস্তি দেয়। কেউ রাগের মাথায় বা আদর্শের গরমে দুএকটা খুন করে ফেললো। অমনি তার ফাঁসি বা যাবজ্জীবন কারাবাস। যারা গণ-খুনী, তাদের কখনো শাস্তি হয় না। এখন যিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী, তিনি এক দশক আগে হঠাৎ স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আইন জারি করায় কতলোক না খেয়ে মরেছে বা আত্মহত্যা করেছে, কাগজে প্রতিদিন খবর বেরুতো। যারা ভারত বিভাগে রাজি হয়েছিলেন, কয়েক লক্ষ মানুষের মৃত্যুর জন্য সরাসরি তাঁরা দায়ী নন?

শ্রীকৃষ্ণন চেট্টির জন্য হঠাৎ খুব দুঃখ বোধ করলেন প্রিয়নাথ। কত বয়েস হয়েছিল ছেলেটির? হয়তো তাঁর নিজের ছেলেরই বয়সী, সে নিজের স্বার্থের জন্য কিছু করেনি. একটা আদর্শের জন্য···সারা দেশ তার জন্য কাঁদলো না? ভগৎ সিং-এর ফাঁসির আগে স্বয়ং গান্ধীজী তাঁর ফাঁসি আটকাবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন। তখন শাসক ছিল বিদেশীরা, আর এখন গান্ধীজীর চ্যালারাই দিল্লীর কর্তা, তাঁরা একজন আদর্শবাদী যুবকের ফাঁসির দণ্ড শুনেও মুখ বুজে চোখ ফিরিয়ে রইলেন? রাষ্ট্রপতির একটি কলমের খোঁচাতেই তো ছেলেটি বেঁচে

যেতে পারতো।

শ্রীকৃষ্ণন চেট্টির ছবিও দেখেননি প্রিয়নাথ। তবু চোখ বুজে তিনি ঐ ছেলেটির মুখখানি দেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

তরুণ শিক্ষকদের তর্কাতর্কি এখন অন্য দিকে মোড় নিয়েছে। অন্য বিষয়বস্তু যাই থাকুক, খানিকক্ষণ স্থানীয় রাজনীতি নিয়ে না চ্যাঁচালে ঠিক গলার সুখ হয় না। আর কয়েকজন মিলে দল বেঁধে একটি সিনেমায় যাবার পরিকল্পনা করছে।

ছুটো আন্দাজ প্রিয়নাথ উঠে পড়লেন।

এ রকম অসময়ে বাড়ি যাওয়া অভ্যেস নেই তাঁর। বাড়িতে যাবেনও না। বেশ কয়েকদিন ধরেই একটা ইচ্ছে লালন করছিলেন মনে মনে, আজ সেই সুযোগ এসেছে।

প্রিয়নাথের পকেটে এক টাকা ছু টাকার বেশী থাকে না। প্রয়োজন হয় না কখনো। বিড়ি-সিগারেট পানের নেশা নেই, পারতপক্ষে রিক্‌শাতে পর্যন্ত চড়েন না। গত তিন বছরের মধ্যে একদিন মাত্র ট্যাক্সি চেপেছেন, এক ছাত্রের বাড়িতে পড়াতে পড়াতে হঠাৎ মাথা ঘুরে চেয়ার থেকে পড়ে যাওয়ায় তারাই একটু বাদে জোর করে একটা ট্যাক্সিতে তুলে দেয়।

অঙ্কের শিক্ষক হরেনবাবুর কাছ থেকে কুড়িটা টাকা ধার নিলেন। যে কারণেই হোক মাসের শেষ তারিখেও হরেনবাবুর পকেটে একশো ছুশো টাকা থাকে। কেউ কেউ বলে, উনি নাকি সুদের কারবার করেন। সে যাই হোক, তা নিয়ে প্রিয়নাথের মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

—হঠাৎ টাকার দরকার হলো?

—এই একটু বর্ধমান যাবো।

—শ্বশুরবাড়িতে নাকি? মিষ্টি নিয়ে যেতে হবে নিশ্চয়ই!?
হরেনবাবু পকেট থেকে এক তাড়া দশ টাকার নোট বার করে তার থেকে গুনে গুনে তুলে দিলেন ছুখানা। সুদের কথা কিছু বললেন না অবশ্য।

হাওড়া স্টেশনে এসে বর্ধমানের টিকিট কাটলেন প্রিয়নাথ। এদিকেই তাঁর শ্বশুরবাড়ি হলেও বছর দশেক ধরে কোনো সম্পর্কই আর নেই। যাওয়া আসাই বন্ধ।

প্রিয়নাথ অনেকদিন ট্রেনে চড়েননি। তাঁর ধারণা ছিল ট্রেনের কামরায় খুব গোলমাল হয়, সবাই নানা রকম আলোচনায় মত্ত হয়ে থাকে যাত্রাপথটুকু। কিন্তু কেউ কোনো কথা বলছে না, সমস্ত মুখগুলি নীরব, যেন একটা থমথমে ভাব। শতকরা সত্তর জনেরই চেহারা স্বাভাবিকের চেয়েও রোগা, মুখে প্রসন্নতা নেই, দৃষ্টির মধ্যে, যা হবার তা তো হবেই, এইরকম একটা ভাব। আশ্চর্য, এরই মধ্যে অন্ধ ভিখারি এসে উৎকট গান শুরু করলেও তবু কয়েকজন পয়সা দেয়।

বর্ধমান স্টেশনে এসে লোকজনদের জিজ্ঞেস করে প্রিয়নাথ একটা বাসে উঠে পড়লেন। খানিক পরে নামলেন ভাতার নামে একটা জায়গায়। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি নামলো। সাজ্ঘাতিক আকাশভাঙা বৃষ্টি। প্রিয়নাথ একটা চায়ের দোকানের ছাউনির তলায় দাঁড়ালেন।

প্রায় আধঘণ্টা পর বৃষ্টির তোড় একটু কমলো বটে কিন্তু ছাড়লো না একেবারে। আকাশের অবস্থা দেখে মনে হয় আজকের মতন, সূর্যের ছুটি হয়ে গেছে। এখনো যেতে হবে বেশ খানিকটা, এরকম বৃষ্টির মধ্যে জলকাদার ,পথ দিয়ে হাঁটা সম্ভব নয়। অথচ এতদূর এসে ফিরে যাওয়ারও কোনো মানে হয় না। এতসব অসুবিধে সত্ত্বেও প্রিয়নাথ বেশ উৎফুল্লই বোধ করেছেন। এরকম সম্পূর্ণ অকারণ অভিযানে তিনি আগে কখনো বেরোননি।

বাধ্য হয়েই একটা সাইকেল রিক্শা নিতে হলো। এবং কিছুদূর যাবার পর সারি সারি হোগলা পাতার ঘর এবং তাঁবু দেখেই তিনি বললেন, থামো।

রিক্শাওয়ালা জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাবেন?

প্রিয়নাথ বললেন, কোথাও না।

তারপর একটু ইতস্তত করে বললেন, তুমি বাপু আমার জন্য

এখানে দশ পনেরো মিনিট অপেক্ষা করতে পারবে? আমি আবার ফিরে যাবো।

চটি জোড়া রিক্‌শাতেই খুলে রাখলেন। তারপর ধুতি গুটিয়ে কাদার মধ্য দিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে এগিয়ে গেলেন।

যুদ্ধ নেই, দাঙ্গা হাঙ্গামা কিছু নেই, তবু হাজার হাজার মানুষ কেন ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলে আসে? দশ বারো বছর এক জায়গায় থাকলে সেই জায়গার ওপর একটা মায়া পড়ে যায় না? যতই রুক্ষ, অনুর্বর হোক। তবু নিজের জমি ছেড়ে হট করে কারুর কথা শুনে এত মানুষ চলে আসতে পারে অনিশ্চিত আশায়? গাছতলায়, রেল স্টেশনে কিংবা খোলা মাঠে পড়ে থাকবে অথচ ফিরে যেতে চায় না, কী এর রহস্য। এটা কি মানুষের প্রকৃতি বিরুদ্ধ কাজ নয়? কুড়ি, পঁচিশ কি তিরিশ বছর ধরে যারা এ-দেশে আছে, তাদের নাম এখনও উদ্বাস্তু।

সুকুমার রায়ের 'বুড়ির বাড়ি' নামে একটি কবিতা আছে। সেই কবিতার বর্ণনাও যেন এই বাড়িগুলোর কাছে হার মেনে যায়। ছেঁড়া চাটাই, পুরোনো কাঁথা আর কঞ্চি দিয়ে কোনোক্রমে খাড়া করা খুপরি খুপরি ঘর। সেই রকম এক একখানা ঘরে পাঁচ-সাত জন নারী, পুরুষ, শিশু। এ ছাড়া রয়েছে কিছু কিছু তাঁবু, যার অনেক-গুলোই আজকের ঝড়বৃষ্টিতে হেলে পড়েছে। ঘর বা তাঁবুগুলোর মেঝে বলে কিছু নেই, থকথক করছে কাদা। পেছনের কচু বনে গোঁয়া গোঁয়া করে ব্যাঙ ডাকছে। কাছাকাছি সাপখোপের রাজত্ব থাকা বিচিত্র কিছু নয়।

জল কাদা মাখা অবস্থায় প্রিয়নাথ সেখানে এসে দাঁড়ালেন।

একটু পরেই একজন জোয়ান চেহারার পুরুষ এসে জিজ্ঞেস করলো, কী চাই আপনের?

প্রিয়নাথ বললেন, কিছু নয়।

অনেকদিন আগেই পুলিশ এদের জোর করে ফেরত পাঠাবার চেষ্টা করেছিল। এরা যেতে চায়নি, তারপরই পুলিশের সঙ্গে বচসা

ও খণ্ডযুদ্ধ। কী অসম সেই যুদ্ধ। বুড়ো, শিশু ও স্ত্রীলোকদের বাদ দিলে যে কজন পুরুষ রয়েছে, তাদের অধিকাংশই রোগা ডিগডিগে চেহারা, খালি গায়ে পাঁজরা কখানা গোনা যায়, তাদের হাতে বাঁশের লাঠি, ইঁট, এই হলো এক পক্ষ। আর পাঁচ ফুট ন' ইঞ্চি উচ্চতা ও আটত্রিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি না হলে পুলিশ বিভাগে কোনো লোক নেওয়া হয় না, তাদের শরীর ঘুষে ও ব্যায়ামে পুষ্ট, তাদের হাতে বন্দুক ও টিয়ার গ্যাস সেল। এ যুদ্ধের ফলাফল তো জানাই। কেউ বলে তিনজন, কেউ বলে আটজন রিফিউজি মারা গেছে। তাদের লাশ পোঁতা আছে এখানকারই মাটিতে। তাই নিয়ে আবার কতরকম রাজনৈতিক বিতর্ক।

প্রিয়নাথ লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় দেশ ছিল?

লোকটি রুক্ষ স্বরে বললো, কোথাও না! আমরা কি মানুষ? মানুষেরই দ্যাশ থাকে। আমরা সব জন্তুজানোয়ার, আমাদের কোনো দ্যাশ থাকতে নাই।

প্রিয়নাথ খুব সঙ্কুচিত হয়ে গেলেন। তিনি বক্তা নন, লোকটির উষ্মার কোনো উত্তর দেবার সাধ্য তাঁর নেই। তিনি মিনমিন করে বললেন, ভাই, আমি একজন অতি সাধারণ লোক, আমারও বাড়ি ছিল মৈমনসিং-এ।

লোকটি বললো, তবু এই ইণ্ডিয়া এখন আপনাগো। আপনেরা ভদ্দর লোক, আপনেরা বামুন কায়েত, তেনারা কেউ রিফিউজি ক্যাম্পে থাকে না। আপনেরা সব এখন শুদ্ধ হইয়া গেছেন। আমরা ওপারেও ছোটলোক ছিলাম, এপারেও ছোটলোক, কুকুর বিড়ালের মতন, আমাগো খাওয়া করেন—

দূরে একটা তাঁবুতে হঠাৎ কান্নার রোল উঠলো। লোকটি হিংস্র-ভাবে হেসে প্রিয়নাথকে বললো, ঐ যে আর একজন মরলো। সকাল থিকাই ধুঁকতে ছিল। আমরা মরলে তো আপনেগোই লাভ। আমরা সক্কলে এক সঙ্গে মরলে আপনেরা খুশী হন।

আরও কয়েকজন এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। সকলেরই মুখ

রাগী নয়, বরং বেশীর ভাগ মুখগুলির সাঙ্ঘাতিক মলিন ও নৈরাশ্য মাখা, ওরা নিছক বেঁচে আছে, কিন্তু ওরা যেন জীবন্ত নয়।

তাদের একজন বললো, না খাইতে দিয়া আমাগো তাড়াইয়া দিলেন। দণ্ডকারণ্য পাকিস্তানের থিকাও খারাপ। বাঙালী বইলা লোক সেখানে আমাগো গায়ে থুতু দেয়।

প্রিয়নাথ আর দাঁড়ালেন না। একটি কথাও না বলে পেছন ফিরে হাঁটতে লাগলেন।

রিক্‌শায় ওঠার পর তিনি বিড়বিড় করে বললেন, এরা যখন পারে তখন আমিও পারবো।

গোটা রাস্তাটা তিনি এই কথাটাই মনে মনে মন্ত্রের মতন জপ করতে লাগলেন।

তাঁর মনে আর একটা ছবিও ভেসে উঠতে লাগলো বারবার। একটা নারকোল গাছ ঘেরা একতলা সাদা বাড়ি। উঠোনের খুব কাছেই পুকুর। এক ঝাঁক বাচ্চা নিয়ে মস্ত বড় একটা শোল মাছ সেই পুকুরের জলে ভেসে ওঠে মাঝে মাঝে। পুকুরের ওপাশে আমবাগান। কী শান্ত, স্নিগ্ধ সেই বাড়িটির ছবি, মনে হয় যেন স্বর্গের একটা টুকরো।

ঐ বাড়িটি ছিল প্রিয়নাথের। স্কুল থেকে রিটায়ার করে তিনি ঐ বাড়িটিতে গিয়ে থাকতে পারতেন। প্রিয়নাথ মনে মনে বললেন, আমি কখনো জুয়া খেলিনি, মদ কিংবা মেয়েমানুষের পেছনে কতলোক টাকা ওড়ায়, আমি তা কিছুই করিনি, তবু ঐ বাড়ি আমার হাত থেকে চলে গেল। এজন্য কেউ আমায় সামান্য সমবেদনা পর্যন্ত দেখালো না।

ঐ বাড়িতে প্রিয়নাথের মা বাবা ও ছোট ভাই থাকতেন। ছোট ভাইটি খুন হলেন পঞ্চাশ সালে। বুড়ো বুড়ী সব ছেড়ে-ছুড়ে কলকাতায় এসে উঠেছিলেন প্রিয়নাথের বাসাবাড়িতে। প্রিয়নাথের বাবা তাঁর শেষ দিনটি পর্যন্ত ঐ বাড়ির জন্য শোক করে গেছেন। তবে অবশ্য একথা ঠিক, ব্রাহ্মণ বলেই তো প্রিয়নাথের মা বাবাকে রিফিউজি

কলোনিতে কখনো থাকতে হয়নি।

প্রিয়নাথ আবার বললেন, এরা যখন পেরেছে, তখন আমিও পারবো।

রাত আটটা আন্দাজ বাড়ি ফিরে এসে প্রিয়নাথ তাঁর স্ত্রীকে বললেন, কাল বাদে পরশু মাস পয়লা, সে কথা মনে আছে তো? সেদিন কিন্তু এ বাড়ি ছেড়ে আমরা নতুন বাড়িতে যাবো।

কল্যাণী যেন আকাশ থেকে পড়লেন! কয়েকদিন প্রিয়নাথ চুপচাপ থাকায় ব্যাপারটা চাপা পড়ে গিয়েছিল। কল্যাণী ভেবেছিলেন এটা কথার কথা। এমন চমৎকার বাড়ি ছেড়ে কেউ যায়? এতদিনের সংসার কি উপড়ে তোলা সহজ কথা? তাছাড়া সবাই বলছে, এ বাড়ি ছাড়ার কোনো দরকার নেই, কিছুতেই বাড়িওয়ালারা তুলতে পারবে না।

—সত্যি সত্যি যাবো?

—আমি আবার মিথ্যে কথা কবে বলি?

—সে বাড়ি আমরা আগে একবার দেখবো না?

—আমি কি দেখতে বারণ করেছি একবারও? কাল পর্যন্ত লোক থাকবে সেখানে। অবশ্য আগেও দেখতে পারো। আজ যাবে? চলো, আমি যাচ্ছি।

—এখন, এই রাত্তিরে?

—কলকাতা শহরে আটটা আবার রাত নাকি?

কল্যাণী তাঁর স্বামীর মুখের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর নিজের ইচ্ছে অনিচ্ছের কোনো দামই নেই, বাড়ি যখন ঠিকই হয়ে গেছে, তখন আর দেখে লাভ কী? যেমন বাড়িই হোক, সেখানেই তো থাকতে হবে। কেঁদে-কেটে কিংবা ঝগড়াঝাঁটি করে স্বামীর মত পাল্টাবার মতন রুচি কল্যাণীর নেই।

—থাক, যেদিন যাবো, একেবারে সেদিনই দেখবো।

—কেন চলো না, শাড়িটা পাল্টে নাও!

কল্যাণী ঠাণ্ডা গলায় বললেন, আমার যদি যেতে ইচ্ছে না করে

তা হলেও কি তুমি আমায় জোর করে নিয়ে যেতে চাও? চলো তা হলে যাচ্ছি।

কল্যাণীর ডাক নাম লীনা, প্রিয়নাথ সেটাকে লীনু করে নিয়েছিলেন। বহুদিন পর সেই নামে ডেকে তিনি নরমভাবে বললেন, লীনু, তোমাকে কয়েকটা কথা বলি, একটু বসো।

জলে ভেজা পাঞ্জাবিটা গায়ের সঙ্গেই শুকিয়েছে। প্রিয়নাথের ঠাণ্ডা সহ্য হয় না কিন্তু আজ তাঁর মন প্রফুল্ল আছে। পাঞ্জাবিটা খুলে ফেলে তিনি অন্য একটা পরলেন।

—আমি এখানে বাড়ি ভাড়া দিই একশো পাঁচ টাকা। এতেই মাসের শেষে টানাটানি হয়। এর থেকে বেশী ভাড়া দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ, রোজগার বাড়েনি। আমরা ছেড়ে গেলে মিহিররা এই ফ্ল্যাট অন্তত ছশো টাকায় ভাড়া দেবে। ওদেরও রোজগারপাতি এখন কম।

—তুমি ওদের উপকার করতে চাইছো?

—ওদের উপকার করি না করি, আমি অন্তত কোনো অন্যায় করতে চাই না। আমরা মামলায় হেরে গেছি, এখানে থাকার আর কোনো আইনত অধিকার নেই আমাদের। আমরা জবর দখল করে থাকতে গেলে ওরাও জোর করে আমাদের ঘটি-বাটি বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গলা ধাক্কা দিয়ে আমাদের বার করে দিতে পারে। সেটা কি আমাদের পক্ষে সম্মানজনক হবে?

—কিন্তু দেবু যে বলছিল, এখনো আবার।

—সেটা দেবু এখন বলছে। সেটা কথার কথা। মামলার সময় আমার অসুখ ছিল, আমার দুই ছেলের কেউই কোর্টে যেতে পারেনি, তারা ব্যস্ত ছিল। অর্থাৎ মামলায় হারি বা জিতি, তাতে ওদের কিছু যায় আসে না। কেমন কি না?

—দেবু তো তখন অফিসের কাজে বাইরে গেল, আর টোটো।

—যে কাজেই ব্যস্ত থাকুক, সেটা বাড়ি ছাড়ার মামলার চেয়ে জরুরী। সুতরাং এখন এ বাড়ি ছাড়তে হলে ওদের আর আপত্তি

থাকার কথা নয়। লীনু, আমরা উদ্বাস্তু, এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাওয়াই তো আমাদের নিয়তি। জীবনের আর কটা মাত্র বছর বাকি আছে। আমি ঠিক করেছি, আর কোনো অন্যায়, মিথ্যে বা ভণ্ডামির প্রশ্রয় দেবো না। ওঠো, শাড়িটা বদলে নাও, চলো, বেড়াতে বেড়াতে একটু ঘুরে আসি আমাদের নতুন বাড়ির কাছ থেকে।

টোটো এখনো ফেরেনি। সে তো আর জানে না যে তার বাবা আজ এত তাড়াতাড়ি বাড়িতে আসবেন। জাপানী একাই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়া চালিয়ে যাচ্ছে।

—জাপানী যদি যেতে চায়, ওকেও বলো।

টোটোর কথা উল্লেখও করলেন না প্রিয়নাথ। সে যে অনেক দিনই এ সময় ফেরে না, সেটা যেন তাঁর অজানা নয়।

শ্যামবাজার পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে বাস ধরে ওরা তিনজন চলে এলেন মানিকতলায়। তারপর মিনিট দু-এক হেঁটেই একটা বস্তির মুখে এসে প্রিয়নাথ মুচকি হেসে বললেন, এসো, এর ভেতরে।

কল্যাণী আর জাপানী তখনো কিছু বুঝতে পারেনি, ভাবলো বুঝি এর মধ্যে দিয়ে অন্য কোথাও যেতে হবে।

সরু গলি এঁকেবেঁকে ঘুরে গেছে। ছপছপ করছে জল। তার ভেতর দিয়ে কিছুটা এসে একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে প্রিয়নাথ বললেন, এই যে!

জাপানী মায়ের দিকে তাকিয়ে বললো, আমরা এখানে থাকবো?

প্রিয়নাথই উত্তর দিলেন, কেন, এখানে কি মানুষ থাকে না? অনেক খোঁজ করে তবে সন্ধান পেয়েছি।

দরজায় কয়েকবার টোকা দিলেন প্রিয়নাথ। ভেতরে মিটমিট আলো জ্বলছিল। একটি সতেরো-আঠারো বছরের ছেলে দরজা খুলে দিল। ঘরটা একদম ফাঁকা, শুধু একটি খাটিয়া পাতা, বোঝা যায়, ছেলেটি শুয়েছিল ওখানে।

—যারা ছিল তারা চলে গেছে?

ছেলেটি বললো, তারা পরশু ভোরেই পালিয়েছে। টাকা দিয়ে যায় নি শালা। রাম হারামী শালা।

প্রিয়নাথ একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, আমরা নতুন ভাড়াটে, পরশু থেকে আসবো—এখন একটু দেখবো ভেতরটা।

ছেলেটি খুব সন্দেহজনক চোখে ওদের দেখলো আপাদমস্তক। বিশেষত জাপানীর শরীরে ওর দৃষ্টিটা লেগে রইলো অনেকক্ষণ।

মা আর মেয়ে রুদ্ধবাক, ঘোর লাগার মতন অবস্থা।

ছেলেটির হাতে হারিকেন দেখে প্রিয়নাথ জিজ্ঞেস করলেন এ কি, আলো নেই ?

—হারামীরা সব বালবগুলো খুলে নিয়ে পালিয়েছে।

প্রিয়নাথ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, এসো।

ভেতরে পা দিয়ে তিনি আবার বললেন, ছাখো, এই ঘরটা আমাদের শোবার ঘরের মতনই বড়, পাশে আর একটা ঘর আছে।

হারিকেনটা নিজের হাতে নিয়ে অন্য একটি দরজা দেখিয়ে বললেন, পাশেই আর একটা ঘর, রান্নার জায়গা, একটা ছোট উঠোনও আছে ···আলাদা বাথরুম নেই অবশ্য, কিন্তু আমি কথা বলে রেখেছি, এখানেই একটা টিনের চালা দিয়ে ঘর বানিয়ে নিতে হবে, কাছেই টিউবওয়েল আছে।

উঠোনে দাঁড়িয়ে প্রিয়নাথ বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গে বললেন, এই ছাখো, বলেছিলাম না, একটা কদম গাছ আছে।

সেই কদম গাছের মাথার ওপর দিয়ে চাঁদ উঠেছে। বর্ধমানে অত বৃষ্টি, কিন্তু কলকাতার আকাশ পরিষ্কার, তকতকে নীল, সুন্দর স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না।

আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে কল্যাণী জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কাকে শাস্তি দেবার জন্য আমাদের এখানে নিয়ে আসছো ?

প্রিয়নাথ বললেন, কাকে আবার শাস্তি দেবো! অন্য কারুকে

শাস্তি দেবার ক্ষমতা কি আমার আছে? শাস্তি যা পাবার আমাকেই পেতে হবে।

॥ ৮ ॥

দেবকুমার অফিসে ছুটিই নিয়ে ফেললো, যদিও খুব জরুরী কাজ ছিল।

বাবার সঙ্গে তার কোনোদিনই ঠিক রাগারাগি বা ঝগড়া হয়নি তবু সে পারতপক্ষে বাবার সামনে আসতে চায় না। এই জন্যই সে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যায় বিকেলের দিকে যখন বাবা থাকেন না।

অনুরাধাই খবরটা দিয়েছে। সকালে এক কাপ চা খাওয়ার পরই দেবকুমার অনুরাধাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি যাবে?

অনুরাধা বললো, আমি এক্ষুনি তৈরি হয়ে নিচ্ছি।

—বুনবুন কোথায় থাকবে?

—ওকেও নিয়ে যাবো সঙ্গে।

যখন তখন ট্যাক্সি চড়া অভ্যেস হয়ে গেছে। কিন্তু প্রত্যেকবার ট্যাক্সি নিতে গিয়ে দেবকুমারের একটু খচ করে লাগে। এতখানি বিলাসিতা করার মতন অবস্থা তার নয়। অফিস থেকে সব কেটে কুটে আঠারোশো টাকা দেয়, তাতেও মাসের শেষে একটু টান পড়ে। একমাত্র টুরে গেলেই যা কিছু টাকা বাঁচে। সেই জন্যই দেবকুমার ইচ্ছে করে ঘন ঘন টুর নেয়।

বুনবুন সঙ্গে থাকলে অনুরাধা বাসে ওঠার কথা চিন্তাই করতে পারে না। বুনবুন একটা লাল রঙের ফ্রক পরে আছে, ইস্কুল যেতে না হওয়ায় সে খুব খুশী।

অনুরাধা বললো, যদি তুমি চাও, আর তোমার বাবা মা রাজি থাকেন, তা হলে তুমি ওদের আমাদের বাড়িতেও নিয়ে আসতে পারো।

দেবকুমার বললো, এইটুকু জায়গায়···এর মধ্যে ওরা থাকবে কী করে?

অনুরাধা বললো, সে আর কী হবে! হঠাৎ বিপদে পড়লে মানুষ থাকে না এরকমভাবে? ধরো, যদি ওঁদের বাড়িতে আগুন লাগতো।

দেবকুমার একটুক্ষণ চুপ করো রইলো। তাদের রাজবল্লভ পাড়ার বাড়িতে মোটামুটি বেশ বড় তিনখানা ঘর, সেখানেই অনুরাধা তার শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে এক সঙ্গে থাকতে পারলো না। এখন দেড়খানা ঘবের এক চিলতে ফ্ল্যাটে ওদের এনে রাখতে চাইছে। অনুরাধা বললো, দরকার হয় আমি বুনবুনকে নিয়ে এক মাসের জন্যে বাপের বাড়ি চলে যেতে পারি। ওঁরা আমাদের ফ্ল্যাটে মাসখানেক থাকলে তার মধ্যে কিছু একটা ··

অর্থাৎ অনুরাধা নিজে আর শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে কোনোদিন থাকবে না। নেহাত তাঁদের বিপদ বলে সাহায্য করতে চাইছে। কিন্তু আসল সমস্যা এটাই যে ওঁরা সাহায্য নিতে চান না। দেবকুমার এ সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। সে বললো, দেখি ওঁদের যাওয়াটাই আটকানো দরকার। ও বাড়ি ছাড়ার কোনো মানে হয় না। বাবা মাঝে মাঝে এমন গোঁয়ার্তুমি করেন।

অনুরাধা বললো. তোমার বাবাকে আমি শ্রদ্ধা করি।

এতেও দেবকুমার আবার অবাক হলো। অনুরাধা তার বাবাকে সহ্য করতে পারেনি বলেই দেবকুমারকে বাড়ি ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল।

গতকাল জাপানী এসেছিল এ বাড়িতে। সেই অনুরাধাকে সব বলে গেছে। দারুণ অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে জাপানী ভেবেছে এ সময় একমাত্র দাদা বৌদিই ব্যাপারটাকে আটকাতে পারে।

বাড়িতে এসে দেবকুমার একটু বেশ হৈচৈ আশা করেছিল। সে রকম কিছুই নেই। অবশ্য, কেনই বা হৈচৈ হবে।

প্রিয়নাথ একাই বিছানা-পত্র বাঁধছেন। আলমারি থেকে সমস্ত জামাকাপড় বার করে মেঝেতে ছড়ানো। তোলা উনুনটা বারান্দায়। পাকা উনুনটা ভেঙে শিকগুলো বার করে নিচ্ছেন কল্যাণী; আজ এ বাড়িতে রান্না হবে না।

দরজা খুলে দিয়েই জাপানী কাতরভাবে বললো, দাদা, তুমি বারণ করো। বাবা কিছুতেই কারুর কথা শুনছেন না।

ঘর থেকে প্রিয়নাথ একবার ছেলের দিকে চোখ তুলে তাকালেন শুধু, কোনো কথা বললেন না। বুনবুন গিয়ে দাদুর কাঁধ জড়িয়ে ধরলো।

দেবকুমার নিজেই এগিয়ে এসে বললো, বাবা, আপনি আজই বাড়ি বদলাচ্ছেন ?

—হ্যাঁ।

—আমার এক বন্ধু একটা বাড়ির খবর দিয়েছিল, সামনের মাসেই পাওয়া যেতে পারে। বেশ ভালো বাড়ি।

—কোথায় ?

—পার্ক সার্কাসের দিকে।

—কত ভাড়া ?

—সাড়ে তিনশোর মতন।

—অত ভাড়া দেবার সামর্থ্য আমার নেই। তাছাড়া অতদূর থেকে রোজ আমি ইস্কুল করতে পারবো না, ট্রাম বাস ভাড়াও অনেক লেগে যাবে।

—কিন্তু এক্ষুনি এ বাড়ি ছেড়ে দেওয়ারও তো কোনো দরকার ছিল না।

—কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী আজই ছেড়ে দেবার কথা।

—আমি মা-কে বলেছিলাম···

বুনবুন বললো, দাদু তোমরা নতুন বাড়িতে যাচ্ছো ? আমিও থাকবো সেখানে।

বাইরের দরজার কাছে কে যেন খটখট করলো। তারপর ডাকলো, স্যার!

বাড়িওয়ালাদের ছেলে পরিতোষ। দেবকুমারেরই বয়েসী। অনেক দিন সে ওপরে আসে নি। মামলা মোকদ্দমা হওয়ার সময় থেকে ওদের সঙ্গে কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য এক সময় পরিতোষও ছাত্র ছিল প্রিয়নাথের।

পরিতোষ বললো, স্যার, আপনি…আপনারা আজই চলে যাচ্ছেন ?

প্রিয়নাথ বললেন, হ্যাঁ, গত মাসের ভাড়া দেওয়া আছে। তোমাদের কাছে নোটিস দেবার প্রয়োজন মনে করিনি, কারণ কোর্টের হুকুমই তো ছিল।

পরিতোষ একটু কাঁচুমাচু ভাব করে নোখ খুঁটতে খুঁটতে বললো, আপনি ইচ্ছে করলে ..মানে ভালো বাড়ি-টাড়ি পেলে…মা বলছিলেন এটা ভাদ্র মাস, এ সময় কেউ বাড়ি ছেড়ে যায় না—আপনারা এতকাল ধরে আছেন।

প্রিয়নাথ বললেন, কোর্ট তো ভাদ্র মাস মানে না, তারা এ মাসেই উঠে যেতে বলেছে।

পরিতোষ দেবকুমারের দিকে ফিরে বললো, দেবুদা, তোমরা নাকি মানিকতলার কাছে এক বস্তিতে উঠে যাচ্ছো ?

দেবকুমার মনে মনে বললো, আমরা নয়, আমার মা বাবা ভাই বোন। আমরা তো ল্যান্সডাউনে থাকি।

সে উত্তর না দিয়ে চিন্তিত ভঙ্গি করে রইলো।

পরিতোষ বললো, স্যার, মা বলছিলেন, আপনারা সেই বাবার আমল থেকে আছেন, এরকমভাবে হুট করে চলে যাওয়া আপনি মাথার ওপরে ছিলেন অনেকটা গার্জিয়ানের মতন…তাই মা বলছিলেন, অন্তত এ মাসটা যদি থেকে যেতে চান।

—মামলা মোকদ্দমা যে চলছিল, তা তোমার মা জানতেন না ?

—আজকাল যা বাড়ির ট্যাক্স…আমাদেরও অন্য ইনকাম নেই, বাধ্য হয়েই…মানে আমাদের নিজেদেরই দরকার, তবু মানে আপনারা এরকমভাবে চলে গেলে

—তোমাদের ওপর আমি রাগ করে যাচ্ছি না পরিতোষ। ঠিকই তো, তোমাদেরও দরকার আছে। আমাকে যখন যেতেই হবে, তখন এক মাস আধ মাস আর দেরি করে লাভ কী ? এক জায়গায় ঘর ঠিক করেছি।

—তা বলে বস্তিতে যাবেন? আরও কিছুদিন থেকে না হয় একটা কোনো ভালো বাড়ি-টাড়ি দেখে

—ভালো বাড়ি কেউ আমায় কম ভাড়ায় দেবে? এর চেয়ে বেশী ভাড়া দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। যদি থাকতো, তাহলে ছ'শো টাকা ভাড়া দিয়ে এ বাড়িতেই আমি থাকতাম।

কথাটা ছম করে বুকে লাগলো দেবকুমারের। বাবা যা ভাড়া দেন, আর তার নিজের ফ্ল্যাটের যা ভাড়া দুটো যোগ করলে ছ'শো টাকার অনেক বেশীই হয়ে যায়। অবিচ্ছিন্ন সংসার হলে এখানে থেকে যাওয়ার কোনো অসুবিধেই ছিল না। কিন্তু তা আর সম্ভব নয়।

পরিতোষের বিবেক এখন মুক্ত হয়ে গেছে। এতকালের পুরোনো ভাড়াটে এবং এককালের মাস্টারমশাইকে আরও কিছুদিন থেকে যাবার অনুরোধ জানাতে এসেছিল, তা হয়ে গেছে। এটাও সে করতে এসেছে ছোট ভাইদের সম্পূর্ণ অমতে, নেহাত মায়ের কথায়। আজ-কাল মাসে পাঁচশো টাকার ক্ষতি স্বীকার কেউ করে?

সে বললো, স্যার, তা হলে আপনার পায়ের ধুলোটা একবার নেবো।

উঠে দাঁড়িয়ে প্রিয়নাথ পরিতোষকে আশীর্বাদ করে বললেন, এবার দেখে শুনে কোনো কম্পানীকে ভাড়া দিও, আজকাল শুনেছি লীজ হয়···

তারপর একটু থেমে বললেন, যাবার সময় তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করে যাবো। টোটো ঠ্যালা ডাকতে গেছে, আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই···

তিরিশ পঁয়তিরিশ বছরের সংসার, কত রকম অপ্রয়োজনীয় জিনিস জমে যায়, সেগুলো বেছে ফেলে দিতেও অনেক সময় লাগে।

একটা ছবিহীন কাঠের ফ্রেম হাতে নিয়ে বসে আছেন কল্যাণী। এটাতে কার ছবি, কিসের ছবি ছিল মনে নেই কল্যাণীর। ফ্রেমটা হাতে নিয়ে তিনি ওর অদৃশ্য অন্তরটা মনে করবার চেষ্টা করলেন, কিছুতেই মনে আসে না।

অনেক দিনের পুরনো ফ্রেম। পাশগুলো একটু একটু পচে গেছে, এখন এটা ফেলে দেওয়া হবে, না নিয়ে যাওয়া উচিত? নিয়ে গিয়েই বা কী হবে, ওতে আর কোন ছবি মানাবে?

অনুরাধা জাপানীর ঘরের কাপড়-চোপড় গুছিয়ে দিচ্ছে। এসব কাজ সে ভালো পারে।

একটা খুব সুবিধে, এ বাড়ির প্রত্যেকটি ঘরে একটা করে বেশ বড় দেওয়াল আলমারি রয়েছে। সেই জন্য আলাদা আলমারি কেনার প্রয়োজনীয়তা কখনো দেখা দেয়নি। এখন সেই তিন আলমারি-ভর্তি জিনিসপত্র যাবে কিসে!

অনুরাধা পরিপাটি করে সেই সব জিনিসপত্র গুছিয়ে আলাদা আলাদা কাপড়ের বোঁচকা বাঁধতে লাগলো। সেদিকে এক পলক তাকিয়ে অনুরাধাকে খুব নিষ্ঠুর মনে হলো দেবকুমারের। এইসব জিনিসগুলো কীভাবে এখান থেকে নিয়ে যাওয়া হবে, তার ব্যবস্থা করে দিতে পারে অনুরাধা, কিন্তু সেখানে গিয়ে এগুলো কোথায় রাখা হবে, সেদিকে তার মাথাব্যথা নেই। যেন সে তার বাবা-মাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বস্তিতে পাঠিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত।

ঠিক তক্ষুনি অনুরাধা বললো, আমার একটা আলমারি বিশেষ কাজে লাগে না। জাপানী, সেটা তোকে আমি আজই ওবেলা পাঠিয়ে দেবো।

জাপানী মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে কান্না চাপলো। বৌদি এখনো বস্তির বাড়ি দেখেনি। বৌদি জানে না, যে সেখানকার ঘরে কোনো আলমারির জায়গা নেই।

যেদিন দেবকুমার-অনুরাধারা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যায়, সেদিন কত রকম আয়োজন করতে হয়েছিল। উদ্যোগ পর্ব চলেছিল চার-পাঁচ দিন ধরে। কিছু কিছু জিনিসপত্র আগে আগে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অনুরাধার বাবা খুব সস্তায় যোগাড় করে দিয়েছিলেন দুখানা লরি। তবু যেন সব আঁটে না।

তবে কি এ বাড়িতে দেবকুমারেরই জিনিসপত্র ছিল বেশি? না,

তার নয়, অনুরাধার। যেমন অনুরাধা এইমাত্র বললো, আমার আলমারি। অধিকাংশই বিয়ের সময় পাওয়া। অনুরাধার বাবার সব মক্কেলরা দারুণ সব দামী দামী জিনিসপত্র উপহার দিয়েছিল।

সেদিন আগে থেকেই সকালে জাপানীকে নিয়ে অনুরাধা চলে গিয়েছিল নতুন বাড়িতে, ঘর পরিষ্কার করে গুছোবার জন্য। দেবকুমার এদিকে থেকে গিয়েছিল তদারকিতে। এইসব গোলমালের মধ্যে যাতে বুনবুনের অযত্ন না হয়, সেই জন্য দুদিন আগে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল অনুরাধার মায়ের কাছে। সেদিন এ বাড়িতে সবাই উৎসাহের সঙ্গে জিনিসপত্র টানাটানিতে হাত লাগিয়েছিল। দেবকুমারদের চলে যাওয়াটাকে যাতে কোনোক্রমেই পারিবারিক বিচ্ছেদ বলে মনে কেউ না করে, সেই জন্য কল্যাণী দোতলার লোকদের ডেকে হাসিমুখে জোরে জোরে বলেছিলেন, ওর কম্পানী থেকে সুন্দর ফ্ল্যাট ভাড়া করে দিয়েছে, চমৎকার ব্যবস্থা, ওরা না গেলে টাকাটাও পাবে না, আর শুধু শুধু ফ্ল্যাটটা—

কোনোদিন চ্যাঁচামেচি করে ঝগড়া হয়নি। কল্যাণীরও সে স্বভাব নয় আর অনুরাধারও ব্যবহার অতি সূক্ষ্ম। কিন্তু চাপা মন কষাকষি উঠেছিল চরমে। কারুরই দোষ নেই, শুধু ভুল বোঝাবুঝি।

বাবার সম্পর্কে তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু মা-ও এক ফোঁটা চোখের জল ফেলেননি, দেবকুমাররা যেদিন চলে যায়। যেন এটা অনেকদিন আগেই জানা হয়ে গিয়েছিল, নতুন করে আঘাত কিছু ছিল না।

দেবকুমারই বরং সেদিন লুকিয়ে চোখের জল ফেলেছিল দু-এক ফোঁটা। তার ইচ্ছে হয়েছিল পা জড়িয়ে ধরে বলবে, মা, রাগ করো না। আমায় ক্ষমা করো···। সে সব কিছু অবশ্য করেনি দেবকুমার।

যেমন, আজও তার ইচ্ছে হলো, বাবার হাত জড়িয়ে ধরে বলে, বাবা, আপনি রাগের মাথায় এ কী করছেন? আমার মাকে নিয়ে বস্তিতে রাখছেন? কেন? আমি তো আছি, আমি আপনাদের ভালো জায়গায় রাখবো···। কিন্তু দেবকুমার এমনভাবে বাবার সঙ্গে

কথা বলতে পারবে না। মায়ের কাছে তবু বলতে পারে, কিন্তু কোনো লাভ নেই। বাবা তাতে কর্ণপাতও করবেন না।

টোটো দুটো ঠ্যালাগাড়ি নিয়ে এসেছে। সব জিনিসপত্র তাতেই এঁটে গেল। পঁয়ত্রিশ বৎসরের সংসার দুটো ঠ্যালা গাড়িতে চেপে অনায়াসে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যেতে পারে। তাও তো জাপানী আর টোটোর বইপত্র, টেবল-চেয়ার, জামা কাপড়ই বেশী, প্রিয়নাথ, কল্যাণীর যৎসামান্য। একদিন জাপানী আর টোটো ওদেরও জিনিস নিয়ে চলে যাবে, যেমন ভুটানী আর দেবকুমার নিয়ে গেছে, তখনও প্রিয়নাথ-কল্যাণীর সংসার যদি থাকে, তবে তা বদল করতে একটা ঠ্যালাও লাগবে না।

টোটো যাবে একটি ঠ্যালার সঙ্গে, বাকি ঠ্যালাটার ওপর বসে আছেন প্রিয়নাথ। পাড়ার সমস্ত লোক ভিড় করে দেখতে এসেছে। ওরা যে একটা বস্তিতে উঠে যাচ্ছেন, কী করে যেন সেকথা রটে গেছে সব জায়গায়। দেবকুমারের মনে হলো, সকলে যেন অবজ্ঞার দৃষ্টিতে শুধু তাকেই বিঁধছে। অথচ তার কী দোষ!

—আপনি বরং মায়ের সঙ্গে যান। আমি যাচ্ছি, এই ঠ্যালার সঙ্গে।

তুই তো নতুন বাড়ি এখনো দেখিস নি।

এ কথার আর উত্তর নেই। টোটোও দ্যাখে নি সেই জন্যেই প্রিয়নাথকে যেতেই হবে ঠ্যালার সঙ্গে।

ঠ্যালা দুটি ছেড়ে যাবার পর দেবকুমার ভাবলো, এতদিনে তাদের সংসারটা সত্যিকারই ভেঙে গেল। ল্যান্সডাউন রোডে থাকলেও এতদিন এই বাড়িটাকেই তার মনে হতো আসল বাড়ি। এখানে সে জন্মেছে। জন্ম থেকে আঠাশ বছর কাটিয়েছে এখানেই। আজ থেকে আর এ বাড়ির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

আবার ট্যাক্সি। আজও কল্যাণী কাঁদছেন না। জোর করে টানা হাসি মুখে বিদায় নিলেন সকলের কাছ থেকে। জাপানীই কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। আর বুনবুন কিছুই না বুঝতে পেরে বার বার

একঘেয়ে প্রশ্ন করতে লাগলো। পিসিমণি কাঁদছে কেন? মা বলো না!

ঠ্যালাগাড়ির অনেক আগেই পৌঁছে গেল ট্যাক্সি। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বস্তির মধ্যে ঢুকতে গিয়ে হঠাৎ রাগে ফেটে পড়লো দেবকুমার। ইংরেজিতে সে অনুরাধাকে বললো, বাবা এ রকমভাবে একটা বাজে বস্তির মধ্যে জোর করে উঠে আসা।

অনুরাধা মুচকি হেসে বললো তোমারও খুব অসুবিধে হবে। অফিসের কলিগরা যখন জানবে যে, তোমার বাবা বস্তিতে থাকেন, এসব ঠিক জানাজানি হয়ে যায়, তখন তোমার খুব অস্বস্তি হবে।

—নিশ্চয়ই!

—আবার তুমিই নিজেকে মার্কসবাদী বলে দাবি করো। আসলে আমরা সবাই হিপোক্রিট!

প্রিয়নাথের ডায়েরির কিছু অংশ ঃ

"এক সময় ইচ্ছা ছিল মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের একখানি পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করবো। মানুষ হিসাবে মহাপ্রভুর জীবন আমাকে বরাবরই আকৃষ্ট করে। প্রথম প্রথম স্কুলের চাকরিতে ঢোকার পর কত রকম উচ্চাকাঙ্খা আমার ছিল। বহু রাত্রি জাগরণ করে অধ্যয়ন করতাম। অনেক উপাদান সংগ্রহ করেছিলাম। কিন্তু লেখা আর হলো না।

অন্যের জীবন নিয়ে লিখবো কী নিজের জীবন নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

পুত্র কন্যার মুখ দেখে মানুষের কত আনন্দ হয়। আমার পুত্র কন্যার জন্মের পর থেকেই এ দেশের অধিকাংশ মানুষের সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা দূর হয়ে যায়। তখন সংসার প্রতিপালন করাই যেন একমাত্র কাজ হয়ে ওঠে।

প্রথম বয়সে আমি প্রাইভেট টিউশনি, কোচিং ক্লাস ইত্যাদিকে অবজ্ঞা করতাম খুব। এখন আমি নিজেই সেই জালে বন্দী। গত্য-

স্তরই বা কি ছিল : পুত্র কন্যারা আমার প্রাণাধিক আদরের, তাদের জন্য একটু দুধ যোগাড় করতে হবে না ? তাদের একটু জামা জুতো কিনে দিতে পারবো না ? যুদ্ধের ঠিক পরেই জিনিসপত্র অগ্নিমূল্য, স্কুল থেকে যা বেতন দিত তা দিয়ে দু বেলা গ্রাসাচ্ছাদন করাই দুঃসাধ্য ছিল। তারপর থেকে আমার শুরু হলো অন্য রকম এক জীবন।

ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়াও মাঝে মাঝে বিশ্রাম পায়। কিন্তু আমার কখনো বিশ্রাম জোটেনি। সকাল থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত একটানা পরিশ্রম। শুধু ছাত্র পড়ানো।

পুত্র কন্যার ভাগ্যে আমি গর্বিত ছিলাম। দেবু আমার প্রথম সন্তান। বাল্যকাল থেকেই সে মেধাবী, ব্যবহারেও অতি নম্র ও ভদ্র। স্কুলে সহকর্মীরা সবাই দেবুর প্রশংসা করতেন। একবার খেলার মাঠে তার পা ভেঙে যায়। তারপর যে কদিন শয্যাশায়ী ছিল, স্বয়ং হেড মাস্টারমশাই এসে তাকে দেখে যেতেন। স্কুল কমিটির সেক্রেটারিও একদিন এসেছিলেন। কলেজে পড়ার সময় দেবুর মরণাপন্ন অবস্থা হয়ে ছিল। পুত্রের আরোগ্য কামনায় সম্রাট বাবর যেমন নিজের প্রাণ দিতে চেয়েছিলেন, আমার মনের অবস্থাও তদ্রূপ হয়েছিল। যদিও জানি আধুনিককালে এ রকম প্রাণ বিনিময় সম্ভব নয়। ধার দেনা করে দেবুর জন্য সর্বপ্রকার চিকিৎসা করিয়েছি। ঈশ্বরের কৃপায় দেবু শেষ পর্যন্ত সুস্থ হয়ে ওঠে।

সকলই আমার ভাগ্য !……

দেবুর পিঠোপিঠিই ভুটানী জন্মেছিল। সে আবার মায়ের রূপ পেয়েছে। নাকটি একটু চাপা হলেও মুখখানি বড় লাবণ্যময়। লেখা-পড়াতে সেও মন্দ হয়নি, তাছাড়া মায়ের মতন গান বাজনাতেও তার সহজাত দক্ষতা আছে। দেবু চুপচাপ, শান্ত, আর ভুটানী দুরন্ত, ছটফটে। সারা বাড়ি সে বেড়াতো। মাত্র নয় বছর বয়েসেই বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসবের মণ্ডপে গান গেয়ে সে একটি রুপোর পদক পায়। আমি ভেবেছিলাম, কল্যাণী গান বাজনা ছেড়ে দিলেও তার মেয়ে সঙ্গীতজগতে একদিন সুনাম পাবে।

কিন্তু অতি অল্প বয়েসেই ভুটানীর বিবাহ হয়ে গেল।

ভুটানীর সকল রকম আবদার ছিল আমার কাছে। সাধ্যে না কুলোলেও ভুটানী যখন যা চেয়েছে, আমি দিতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু সে যখন পরিতোষকে বিবাহ করার আবদার ধরে তখন আমি কিছুতেই রাজি হতে পারি নাই। পরিতোষ আমাদের বাড়িওয়ালার ছেলে। একে তো বাড়িওয়ালার সঙ্গে ভাড়াটিয়ার বিবাহ সম্বন্ধ কখনো সুখের হয় না, তার ওপর ওদের সঙ্গে আমাদের জাতের মিল নাই। পুরুষানুক্রমিক রীতি আমি লঙ্ঘন করতে চাই না।

উনিশ বৎসর বয়স হতে না হতেই ভুটানীর বিবাহের জন্য নানা প্রস্তাব আসতে লাগলো। তাকে আমার এম এস সি পর্যন্ত পড়াবার ইচ্ছা ছিল। ছেলেমেয়েদের কলেজে পড়াবার ব্যয়ভার বহন করা একজন স্কুল শিক্ষকের পক্ষে যে কত কঠিন তা শুধু ভুক্তভোগীরাই জানেন। দেবু আর ভুটানী কলেজে ভর্তি হবার পর আমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও সন্ধেবেলা টিউটোরিয়াল হোমের কাজটি নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমার সব সময় চিন্তা ছিল, আমার ছেলেমেয়েদের যেন কোনক্রমেই শিক্ষার ত্রুটি না হয়।

ভুটানী একবার ডায়মণ্ড হারবারের এক অনুষ্ঠানে গান গাইতে যায়। সেই গান শুনে মোহিত হয়ে এক ধনী ব্যবসায়ী কোথা থেকে যেন ঠিকানা সংগ্রহ করে এসে উপস্থিত হয়েছিল আমাদের কাছে। তার পুত্রবধূ করার জন্য সে ভুটানীকে চায়। তারা ব্রাহ্মণ ছিল বটে কিন্তু অত্যন্ত ধনী। তাছাড়া পাত্রের পিতার ভাবভঙ্গি আমি পছন্দ করি নাই। সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন টাকা পয়সার অহংকার ফুটে বেরোচ্ছিল। পত্রপাঠ তাদের বিদায় দেই এবং ভুটানীকে আর কোনো সঙ্গীত অনুষ্ঠানে যেতে নিষেধ করি। ভুটানীকে বলেছিলাম, তুই মন দিয়ে লেখাপড়া কর মা, বিদ্বান পাত্রের সঙ্গে যথাসময়ে তোর বিয়ে দেবো।

এ কথা বলা কি আমার ভুল হয়েছিল? সমরুচিসম্পন্ন পরিবারের মধ্যেই বিবাহ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া উচিত নয়?

পরে জেনেছি, ভুটানী এ জন্য কান্নাকাটি করেছে। সেই ধনী পাত্রপক্ষই তার পছন্দ ছিল। পড়াশুনোয় আর তার মন ছিল না, সেই ডায়মণ্ড হারবারের ছেলেটির সঙ্গে নাকি তার পত্র বিনিময় চলতো। ভয় পেয়ে কল্যাণী আমাকে তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়ে দিতে বলে।

শেষ পর্যন্ত ভুটানীর ভালোই বিবাহ হয়েছে। পাত্র বহুদিন যাবত কানাডা-প্রবাসী। মাঝখানে সে দেশে এসেছিল বিবাহ করতে। ভুটানীকে একবার দেখামাত্রই ও পক্ষের পছন্দ হয়। ভুটানীও বিদেশে থাকার কথা শুনে একবাক্যে রাজি হয়েছিল। সে বিবাহে অমত করবার কোনো উপায়ই ছিল না।

হায়, সেই প্রথম আমি হৃদয়ঙ্গম করলাম যে, গরীবের ঘরে সুন্দরী গুণবতী কন্যা কত বড় অভিশাপ। ভুটানী যদি দেখতে শুনতে খারাপ হতো তবে আমার সাধ্যমতন কোনো গরীব ঘরের পাত্রের সঙ্গে তার বিবাহ দিতাম। যেমন সকলেই দেয়। কিন্তু সুন্দরী, গুণবতী কন্যারা শুধু ধনীদেরই প্রাপ্য। ধনীরা দেশের চতুর্দিকে খুঁজে বেড়ায় এ রকম কন্যাদের। নইলে আমার ভুটানীর খোঁজই বা সেই কানাডার পাত্র-পক্ষ পেল কী করে? আমরা তো সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিই নাই।

পাত্র অতি সুযোগ্য সুশিক্ষিত। পণপ্রথার বিরোধী। এই বিবাহে ভুটানী সুখী হয়েছে। এতে আমাদেরও সুখী হবার কথা। হয়েছি, নিশ্চয়ই হয়েছি। তবে ভুটানী আমাদের সর্বস্বান্ত করে গেছে। ধনীর ঘরে কন্যা দিতে গেলে উপযুক্ত আড়ম্বর করতে হয়, নইলে কুটুম্বদের কাছে মান থাকে না। মানের জন্য মানুষকে কত কী করতে হয়। শাড়ি গয়নাগাটি এবং লোক খাওয়ানোর জন্য বাজার থেকে সাত হাজার টাকা ঋণ করতে হয়েছিল। এছাড়া প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে যা লোন নিয়েছি তা আজও শোধ হয়নি, আর হবেও না। ভুটানী বিদেশে সুখে আছে। তার শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের সঙ্গে বৎসরান্তে একদিন দেখা হয় মাত্র। এইটুকু সম্পর্ক। রঙীন ফটোতে ভুটানীর ছেলে-মেয়েদের মুখ দেখি। ইহজীবনে আর স্বচক্ষে দেখবার আশা করি না……

…একদিন এক খাকি পোশাক রা পুলিশ রাস্তায় আমায় দেখে নমস্কার করে বললো, স্যার, আমায় চিনতে পারেন ?

দীর্ঘ জীবনে হাজার হাজার ছাত্র পার করেছি। সকলের মুখ মনে থাকে না। তবু বললাম, চেনা চেনা লাগছে বটে, তুমি কোন ইয়ারের।

সিক্‌সটি-ফাইভ। স্যার আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।

দিনকাল খারাপ। ছেলেরা যখন তখন পুলিশ মারছে। আবার পুলিশের চর সন্দেহ করে অনেক নিরীহ লোককেও খুন করছে বলে শুনতে পাই।

সুতরাং রাস্তায় দাঁড়িয়ে কোনো পুলিশ-ম্যানের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে দেখলে আবার কে কী মনে করে কে জানে !

অথচ ছাত্র বলে কেউ পরিচয় দিলে মুখ ফিরিয়ে চলে যেতেও পারি না। অনেক সময় প্রাক্তন ছাত্ররা নিজেদের ছেলেদের ভর্তি করাবার জন্য কিংবা প্রাইভেট টিউটরের খোঁজে আমাদের কাছে আসে।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলা নিরাপদ নয় ভেবে তাকে বললাম এখন তো ব্যস্ত আছি। তুমি স্কুলে এসে দেখা করো বরং যে কোনো একদিন।

এর পর সে যা বললো, তাতে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বোধ হয় রাস্তার ওপরে চেতনা হারিয়েই পড়ে যেতাম।

সে বললো, স্যার আপনার ছেলে চিররঞ্জনকে বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দিন। ধরা পড়লে ওকে বাঁচানো শক্ত হবে। কাশীপুর মার্ডার কেসে ও ছিল আমরা জানি।

চিররঞ্জন মানে টোটো ? সে খুন করেছে ?

আমার তক্ষুনি ইচ্ছে হলো, সেই পুলিশ অফিসারটিকে এক চড় মারতে।

সে বললো, স্যার, সঠিক খবর না জেনে আপনাকে বলছি না। আজকালের মধ্যেই আপনার বাড়ি সার্চ হবে। পুলিশ ওকে একবার

পেলে আর ছাড়বে না।

তারপর সে আর কী কী বলেছিল আমার ঠিক মনে পড়ে না। কান দিয়ে শুনলেও মর্মে প্রবেশ করেনি। টোটোর বয়েস মাত্র সতের বৎসর পাঁচ মাস। সে মানুষ খুন করতে পারে? এই কথাটাই বার বার ভাবছিলাম। না, অসম্ভব, আমার পুত্র হয়ে এ কাজ করা তার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু পুলিশ যখন একবার সন্দেহ করেছে সহজে ছাড়বে না। আজকাল অল্পবয়সী ছেলেরা একেবারেই নিরাপদ নয়। কিছু ছেলে খুনোখুনির রাজনীতিতে মেতেছে বলে পুলিশ যে-কোনো অল্পবয়েসী ছেলেকে পেলেই শোধ নেয়।

প্রায় ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরে এলাম। এক ছাত্রের পরীক্ষা, তার বাড়ির টিউশানিতে সেদিন যাওয়া হলো না।

—টোটো কোথায়?

কল্যাণী কোনোদিন আমার কাছে মিথ্যা কথা বলে না। কিন্তু সেদিন বললো, টোটো শ্যাম পার্কে খেলতে গেছে। তখুনি আমার মনে হলো কল্যাণী সত্য কথা বলছে না।

—টোটোর সর্বনাশ যদি না চাও তবে এখুনি বলো সে কোথায়? পরে আর কেঁদেও কূল পাবে না।

কল্যাণী তবু বললো, সে তো খেলতে গেছে বলেই বেরিয়েছে। রোজ এই সময় শ্যাম পার্কে খেলে।

জামা খুলে ফেলেছিলাম, তক্ষুণি আবার গায়ে গলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। শ্যাম পার্কে সত্যিই অনেকগুলি ছেলে খেলছে। দুপুরে বেশ বৃষ্টি হয়েছিল, সারা মাঠে কাদা, তার মধ্যেই প্রাণের আনন্দে হুটোপুটি করছে একদল কিশোর। দেখে হঠাৎ চোখ জুড়িয়ে যায়। কে বলে যে ছেলেরা শুধু রাজনীতি করে কিংবা পাড়ার রকে বসে ফোক্করামি করে? এই যে ছেলেগুলির প্রাণচাঞ্চল্য এর চেয়ে সুন্দর বুঝি আর কিছু নেই।

জল-কাদায় মাখামাখি বলে ওদের খেলার বিঘ্ন ঘটাতে দেখে কয়েকটি ছেলে বেশ বিরক্ত হলো, তবু আমি প্রত্যেকের মুখ দেখতে

লাগলাম।

টোটো নেই সেখানে।

ছুটি একটি ছেলে চিনতে পারল আমাকে। তাদের একজন এসে আমার পায়ের ধুলো নিতেই আমি জিজ্ঞেস করলাম. হ্যাঁ রে টোটোকে দেখেছিস? সেই ছেলেটি জানালো যে, অন্তত তিন মাস টোটো সেখানে আর খেলতে আসে না।

টোটো যে আর শ্যাম পার্কে খেলে না, সেটা কল্যাণী সত্যিই জানে না? টোটো তার মাকে মিথ্যে কথা বলেছে? তিন মাস আগেও যে ছেলে বিকেলে পার্কে এসে খেলাধুলো করতো, সেই ছেলেই মাত্র এই তিন মাসের মধ্যে অন্যদের সঙ্গে মিশে খুনী হয়ে গেল?

বয়েসের তুলনায় টোটোকে বড় দেখায়। লোকে ভাবে ওর বয়েস কুড়ি-একুশ। কিন্তু চেহারাটা বড় হলেও সতেরো বছরের ছেলের মানসিকতা তো আর একুশ বছরের ছেলের সমান হতে পারে না।

পরে শুনেছিলাম, টোটো তার আগের ছু-রাত্তির ধরেই বাড়ি ফেরেনি! সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

আমার কনিষ্ঠ সন্তান যে ছু রাত্তির বাড়িতে নেই, সে খবর আমি রাখতাম না। এটা আমার অপরাধ। পিতা হয়ে পুত্রের যথেষ্ট দায়িত্ব নিইনি। দায়িত্ব নিয়েই বা কী হয়? তবু তো ছেলে এক সময় পর হয়ে যায়।

ছেলে-মেয়েদের জন্যই তো আমার এতটা খাটাখাটুনি। রাত্রি দশটার আগে বাড়ি ফিরতে পারি না, কোনো কোনোদিন আরও দেরি হয়। শরীর ক্লান্ত থাকে, তখন আর কিছুই ভালো লাগে না। সামান্য কিছু মুখে গুঁজে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়। টোটো, জাপানি প্রায়ই এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে। সকালে আমি বেরিয়ে যাই সাড়ে ছ-টা সাতটার মধ্যে। একটা মোটা টাকার টিউশনির জন্য যেতে হয় সেই আমহার্স্ট স্ট্রিটে। টোটো সেই সময় ছুধ আনতে যায়, তাই তার সঙ্গে দেখা হয় না।

টোটো যে বিপজ্জনক খেলায় নেমেছে, সে যে রাত্রে বাড়ি

ফেরেনি, সে কথা কল্যাণী আমাকে জানায়নি কেন? কল্যাণী আমাকে ভয় পায়?

শুধু ভয় নয়, তারচেয়েও বেশী।

টোটো তার মাকে বলেছে যে, সে কোথায় লুকিয়ে থাকবে, সেটা তার বাবাকে জানাবার দরকার নেই। জানালেই বিপদ। কারণ, পুলিশ যদি বাবাকে ধরে অত্যাচার করে, তাহলে বাবা হয়তো অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে জায়গাটার কথা বলে দিতে পারেন।

পুলিশের অত্যাচারে আমি আমার ছেলেকে ধরিয়ে দেবো? ওরা এই কথা ভাবতে পারলো? আমি যাকে জন্ম দিয়েছি সে আমাকে অবিশ্বাস করে?

সেদিন আমি চৈতন্য হারিয়ে ফেলেছিলাম, বৌমা খুব সেবা যত্ন করেছিল।

তারপর দিনের পর দিন সে কী উৎকণ্ঠা। সে যেন মৃত্যুযন্ত্রণার সমান। চরম শত্রুরও জীবনে যেন এরকম কিছু না ঘটে। টোটো কোথায় জানি না, সে বেঁচে আছে কি মরে গেছে জানি না। পুলিশ মাঠে ঘাটে ছেলেদের মেরে মৃতদেহ গাপ করে দেয় বলে লোকের মুখে শুনি। কল্যাণী বা দেবু কি টোটোর খবর রাখে? ওরা দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করলেও আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারিনি। আমি ওদের পায়ে ধরতে শুধু বাকি রেখেছি। আমার সর্বক্ষণ মনে হতো, ওরা সব যেন এক দলে আর আমি আলাদা। আমার সংসারের মধ্যেই আমি একঘরে হয়ে ছিলাম। সে যে কী কষ্ট, কী কষ্ট। কেউ বুঝবে না।

তারপর একদিন বুকের ব্যথায় অজ্ঞান হয়ে গেলাম, হাসপাতালে গিয়ে থাকতে হলো দশদিন। জীবনে এই প্রথম আমি হাসপাতালের বিছানায় শুলাম।…

দেবু নিজের ইচ্ছেতে বিয়ে করেছে। আমি প্রথমে আপত্তি করেছিলাম, কিন্তু কল্যাণী এমন জোর করতে লাগলো যে আমার আপত্তি টিকলো না। ছেলেদের সঙ্গে তাদের মায়ের যোগাযোগ বেশী।

বউমাকে অবশ্য আমার বেশ পছন্দই হয়েছিল। সচ্ছল পরিবারের উচ্চশিক্ষিতা মেয়ে কিন্তু চালচলনে কোনো অহংকার নেই। ভারী সুন্দর নম্র ব্যবহার। এ মেয়ে আমাদের দেবুর উপযুক্ত।

কিন্তু ছেলে বউ নাতি-নাতনী নিয়ে সুখের সংসার করার ভাগ্য কল্যাণীর নেই। তাই তাকে কষ্ট পেতে হলো। আমার কথা তো আলাদা।

পুলিশের হাঙ্গামা মিটে যাবার পর টোটো যখন বাড়ি ফিরে এলো, সেই মাসেই বউমা বাচ্চা কোলে নিয়ে ফিরলো নার্সিং হোম থেকে। আমাদের প্রথম নাতনী। কী মায়া যে পড়ে গিয়েছিল মেয়েটার ওপর। এক একদিন টিউটোরিয়াল সেরে ফিরে আসবার সময় মনে হতো, মেয়েটা এখন জেগে থাকবে তো? একবার ওকে কোলে নিতে পারবো না!

এক বছর বয়েস হতে না হতেই মুখে বোল ফুটেছিল বুনবুনের। আমি ওর ভালো নাম রাখতে চেয়েছিলাম সীমন্তিনী। ওদের পছন্দ হয়নি। ওরা নাম রেখেছে সুস্মিতা। তা রাখুক, নাম একটা হলেই হলো। আমার কোনো ছেলেমেয়ের নাম রাখার ব্যাপারেই আমার মতামত টেকেনি।

আমি কতক্ষণই বা বাড়িতে থাকি। তবু মেয়েটা আমাকে দেখলেই দাদু দাদু বলে অস্থির হয়ে উঠতো। বিদ্যাসাগর মশাই লিখেছেন স্নেহ অতি কঠিন বস্তু, এত বড় সত্য কথা বুঝি হয় না। আমি আর সব কিছু মায়া মোহ থেকে মুক্ত হবার সংকল্প করেছি, কিন্তু বুনবুনের কথা ভাবলেই আমার বুক টনটন করে।

দেবু তার বউকে নিয়ে এ বাড়িতে টিকতে পারলো না। সে বড় চাকরি করে, সেই অনুযায়ী আদবকায়দা মেনে তাকে চলতে হয়। বাবা মায়ের সঙ্গে এক পরিবারে থাকা আজকালকার অফিসার শ্রেণীর মানুষদের নাকি মানায় না। অফিসের বন্ধুদের মাঝে মাঝে বাড়িতে নেমতন্ন করতে হয়, তাদের সম্মুখে ইস্কুল মাস্টার বাবার পরিচয় দিতে দেবু লজ্জা পেয়েছে। বউমা আধুনিককালের মেয়ে, তার রুচি অন্য-

রকম। আমি বা কল্যাণী কোনোদিন তার কোনো ইচ্ছায় বাধার সৃষ্টি করিনি, তবু সে এখানে মানিয়ে নিতে পারে নি। ওরা বাড়িতে শুয়োরের মাংস এনে খেতে চায়, আমি কল্যাণীকে বলেছিলাম, নিজের ঘরে বসে যদি ওরা ওসব খায় তো খাক, আমার আপত্তি নেই। এই বয়েসে আমি আর গোরু, শুয়োরের মাংসের ছোঁয়াছুঁয়ি সহ্য করতে পারবো না, কিন্তু ওদের যা মন চায় তা করুক। ওরা রাত্রে সিনেমা দেখে ও হোটেলে খেয়ে সাড়ে বারোটা একটায় বাড়ি ফিরেছে। আমি নিজে ওদের দরজা খুলে দিয়েছি। কোনোদিন একটাও রূঢ় কথা বলিনি। আমার পাতলা ঘুম, সামান্য শব্দেইঘু ম ভেঙে যায়। তবু ওরা থাকলো না। যাক, সে জন্য বউমার ওপর আমি রাগ করি না। আমার ছেলেই যখন আমাদের ছেড়ে দূরে থাকতে চায়…

সবচেয়ে দুঃখের কথা, প্রথম সংঘর্ষটি ঘটলো আমার আদরের নাতনী বুনবুনকে কেন্দ্র করেই। তেল মেখে সেদিন আমি স্নান করতে যাচ্ছিলাম। তবু তারই মধ্যে বুনবুন জাপানীর কোল থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার কোলে আসবেই! না নিলেই কান্না। সে সময় কি ঐটুকু মেয়েকে কোন কথা দিয়ে বোঝানো যায়? আমি বুনবুনকে কোলে নিয়ে ওর ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে আদর করছিলাম, হঠাৎ দেবু এসে বললো, বাবা, ওরকম করবেন না। ওরকম করলে বাচ্চাদের অসুখ করে।

আমি নিজের চোখ কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারিনি। আমি কী অপরাধ করলাম। আমি দাদু হয়ে আমার নাতনীকে আদর করতে পারবো না? সে দেবুর মেয়ে, আমার কেউ নয়? আমি আদর করলেই ওর অসুখ করবে? আমি কি ওর ওপর নজর লাগাবো? আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। বিয়ের পর থেকেই দেবু আমার সঙ্গে কম কথা বলে, সামনে থেকে এড়িয়ে এড়িয়ে যায়। সে হঠাৎ এসে আমাকে বিনা দোষে এমন একটা রূঢ় কথা বলতে পারলো?

বুনবুন যেতে চায় না, তবু দেবু জোর করে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল আমার কোল থেকে। আমি হতবাক হয়ে রইলাম।

একটু পরেই আমার মাথায় এসে রাজ্যের ক্রোধ জমা হলো। আমি থরথর করে কাঁপতে লাগলাম। প্রথমে ইচ্ছে হলো. দেবুকে মারি খুব জোরে। অল্প বয়সে মাঝে মাঝে ওকে প্রচণ্ড মেরেছি। কিন্তু চাকরি করা, বিবাহিত, বয়স্ক ছেলেকে কেউ মারে না। অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, নিয়ে যা, আর কোনোদিন ছোঁবো না তোর মেয়েকে। ওকে আর আমার চোখের সামনে আনিস না।

দেবু তখন কী যেন বলবার চেষ্টা করছিল। আমি আর শুনিনি। সেইদিনই চিড় ধরে গেল। তারপর আরও মাস ছয়েক ছিল ওরা আমাদের সঙ্গে। কিন্তু তার মধ্যেই চলে যাবার প্রস্তুতি চলছিল। ওরা সুখে থাক, যেখানেই থাকুক, সুখে থাক, আমি বাবা হয়ে তাই তো চাইবো।...

—হে ঈশ্বর, তোমার কাছে একটা প্রশ্ন করি। সারা জীবন আমি তোমার ওপর ভক্তি রেখেছি। জ্ঞানত কখনো অধর্ম করি নি। সাংসারিক কর্তব্য বলতে যা বোঝায়, তা তো পালন করছি সবই। স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদের নিয়ে একটি সুখী পরিবার গড়ে তোলার জন্য চেষ্টার কোনো ত্রুটি করিনি। ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত লেখাপড়া শেখাবার জন্য কার্পণ্য করিনি কোনোদিন। সাধ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রম করে সৎ পথে উপার্জন করেছি তাদের প্রতিপালনের জন্য।

তার পরিণামে আজ আমি নিঃস্ব অসহায়।

বড় ছেলেকে দিয়েছি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শিক্ষা। যাতে আমার মতন এত কষ্ট করে উপার্জন করতে না হয়। তার অসুখের সময় ধার দেনা করে যতরকম চিকিৎসা সম্ভব সব কিছুর সাহায্যে এবং তোমার দয়ায় বাঁচিয়ে তুলেছি তাকে। আজ সে নিজের স্ত্রী আর সন্তানকে নিয়ে পৃথক বাড়িতে থাকে। তারা সুখী।

বহু টাকা খরচ করে বিবাহ দিয়েছে এক মেয়ের। সে তার স্বামী ও সন্তানদের নিয়ে শুধু পৃথক বাড়ি নয়, বহু দূর দেশে থাকে। ইহ-

জীবনে আর দেখা হবে কি না কে জানে। তারা সুখী।

এই দুই ছেলেমেয়েকে সুখী করার জন্য আজ আমি সর্বস্বান্ত। আর দেড় বছর পরে স্কুলের চাকরিটি যাবে। তারপর পেনসন নেই। গ্র্যাচুইটি নেই, শুধু প্রভিডেন্ট ফাণ্ড সম্বল ছিল, সেখান থেকেও ঋণ করতে বাধ্য হয়েছি। বড়জোর হাজারখানেক টাকা পাবো। তারপর? রিটায়ার করলে আর টিউশানিও ভালো জোটে না। তখন কি গাছতলায় দাঁড়াবো?

এই দেড় বৎসরের মধ্যে জাপানী বি-এ পাস করে যাবে। এবং সে যদি বিবাহ করতে রাজি থাকে, তবে যে কোনো উপায়ে পারি, তার বিবাহ দিয়ে দেবো। টোটোর লেখাপড়ায় মন নেই। সে যা খুশী হয় করবে। সে পুরুষ ছেলে, গায়ে শক্তি আছে, একটা যা হোক কিছু ব্যবস্থা সে করে নিতে পারবে হয় তো।

কিন্তু কল্যাণীকে নিয়ে আমি কোথায় যাবো? বড় ছেলে ভালো চাকরি করে, কিন্তু সে আমাদের সঙ্গে এক সঙ্গে থাকতে ঘৃণা বোধ করেছে, তবু কি আমরা শেষ পর্যন্ত তার গলগ্রহ হবো? এই কি ন্যায়? বৃদ্ধ হয়েছি বলে কি আমার আত্মসম্মান থাকতে নেই? হে ঈশ্বর, তোমার কাছে এর উত্তর চাই।

দেড় বৎসর পর আমি যদি মরে যাই, তবে সব সমস্যার সমাধান হয়। আধুনিককালে আমার মতন পিতার দীর্ঘজীবী হওয়া বোধহয় উচিত নয়। কল্যাণী থাকবে, সে মা হয়ে পুত্র কন্যাদের কাছে অনায়াসে থাকতে পারবে, তাতে কোনো গ্লানি নেই। কিন্তু আমি তা পারি না।

দেড় বৎসর পর যখন আমি রিটায়ার করবো, ঠিক সেই সময়ে যে আমার স্বাভাবিক মৃত্যু হবে, তার তো কোনো মানে নেই। তবে কি নিজে হাতে এই জীবনের অবসানে ঘটাবো?

দুর্লভ এই মানব জীবন। কিন্তু এই জীবনের ঠিক কতখানি অংশ মূল্যবান আর কতখানি অংশ অপ্রয়োজনীয়, তা কে আমাকে বলে দেবে? সংসারের কর্তব্য করতে গিয়ে আমি সহায় সম্বলহীন হয়ে

পড়েছি বলে ষাট বৎসরেই আমার জীবনের শেষ ? আর যাদের অর্থ আছে, প্রতিপত্তি আছে, তারা আরও বহু বছর বাঁচতে পারে। এই কি তোমার সৃষ্টির নিয়ম। অথবা, ষাট বৎসর বয়সে আমি যদি আত্মঘাতী হই, সেটা কি পাপ না পুণ্য ?

অথবা, হয়তো আর একটি পথ খোলা আছে।—

॥ ৯ ॥

মীর্জাপুর স্ট্রিটের একটা চায়ের দোকানে সেই কলেজ জীবন থেকেই দেবকুমারদের আড্ডা ছিল। কলেজ ছাড়ার পরও সেখানে সে অনেকবার গেছে। একটা বন্ধুর দল ওখানে প্রায় রোজই থাকে।

অফিসে ঢোকার পর থেকে আর দেবকুমার সন্ধেবেলা চায়ের দোকানে এসে আড্ডা দেবার বিশেষ সুযোগ পায় না অবশ্য ভালো চাকরি মানেই সর্ব সময়গ্রাসী। অফিসের পরও অফিসের লোকজনদের সঙ্গেই থাকতে হয়, নানারকম মিটিং ও কনফারেন্স তো চলেই, তাছাড়া অফিসের সব শ্রেণীর সহকর্মীরাই বন্ধু স্থানীয় হয়ে যায়, ঘুরে ঘুরে এক একদিন এক একজনের বাড়িতে আড্ডা ও খাওয়া চলে। মাসের মধ্যে এরকম অন্তত দশ পনের দিন তো বটেই। এই চক্র থেকে বিচ্যুত হলে সহকর্মীরা সবাই ভুরু তোলে, তখন সহযোগিতা পাওয়া যায় না এবং সে অফিসে আর উন্নতির আশা থাকে না।

অনেকদিন বাদে দেবকুমার মীর্জাপুরের সেই চায়ের দোকানটায় আড্ডা দিতে গেল। তার মন খারাপ, অফিসের সহকর্মীদের সঙ্গে সেদিন সে কিছুতেই সুর মেলাতে পারবে না। কর্মাশিয়াল ফার্মের অফিসারদের সব সময় হৈচৈ ফুর্তিতে থাকাই নিয়ম।

এক সময় দুখানা টেবল জোড়া দিয়ে দেবকুমাররা দশ এগারো জন বন্ধু বসতো এই চায়ের দোকানে। রাজনীতি, সাহিত্য কিংবা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনায় এখানে তুমুল ঝড় উঠতো।

আজ দেবকুমার এসে দেখলো, পুরোনো বন্ধুদের মধ্যে মাত্র চারজন বসে আছে টেবলে। দেবকুমারকে দেখে তারা কেউ উত্তেজিত হয়ে উঠলো না বা সাড়ম্বর অভ্যর্থনা জানালো না। শুধু একজন বললো কী রে, হঠাৎ এদিকে ? একটা চেয়ার টেনে নে।

দেবকুমার অন্য অনুপস্থিত বন্ধুদের খবরাখবর নিল। তারা কেউই আসে না আজকাল। এই চারজনই এখন স্থায়ী আড্ডাধারী। বিমান রুদ্র, অরুণ আর সুকুমার।

দেবকুমারের পা থেকে মাথায় চোখ বুলিয়ে বিমান বলল, তুই বেশ মোটা হয়েছিস।

দেবকুমার তৎক্ষণাৎ নিজে পেটে হাত রেখে একটু দম বন্ধ করে বললো, কই, না তো ?

রুদ্র বললো, আসলে বোধহয় মোটা হসনি, কিন্তু চেহারাখানা বেশ চকচকে হয়েছে।

অরুণ বললো, তোর জামাটা তো বেশ। বিদেশী ?

দেবকুমার বললো, না, না, এখানেই পাওয়া যায়।

জামাটায় হাত বুলিয়ে অভিজ্ঞ ভঙ্গিতে অরুণ বললো, কেন গুল ঝাড়ছিস। বিদেশী জিনিস, দেখলেই চেনা যায়।

সুকুমার জিজ্ঞেস করলো, তুই যেন এখন কোথায় কাজ করছিস ?

বিমান তার কম্পানিটার নাম বললে।

রুদ্র বললো, ওরা তোকে এখনো ফরেনে পাঠায়নি একবারও ? ও কম্পানির তো সবাই একবার দুবার ঘুরে আসে।

দেবকুমার বললো, পাঠাবে হয় তো ! জানি না এখনো।

রুদ্র বললো, পাঠাবে, পাঠাবে, তুই চিন্তা করিস না। তোদের তো সেন্ট পারসেন্ট প্রফিট। কয়েকটা ওষুধ আছে মনোপলি, তুই প্রোডাকশান, না মার্কেটিং কিসে আছিস ?

—মার্কেটিং।

—যে ওষুধগুলো মনোপলি, সেগুলো দু'এক মাসের জন্য বাজার থেকে হঠাৎ হঠাৎ উধাও হয়ে যায়, তারপর যখন ফিরে আসে, অমনি

দাম বাড়ে। তাই না? ওরা স্টাফদের ফরেনে পাঠাবে না তো কারা পাঠাবে?

দেবকুমার অস্বস্তি বোধ করলো। তার মন খারাপ বলে এসেছিল পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে। এরা যদিও পুরোনো বন্ধু কিন্তু এরা হেরে-যাওয়া দলের। এরা শুধু জিভ তেতো রাখতে ভালোবাসে।

যে-সব বন্ধুরা ভালো ভালো কাজ পেয়েছে, কিংবা জীবনে সার্থক তারা আর কেউ এখানে আসে না। এই চারজন পড়ে আছে, এরা প্রায় বেকার বা পার্ট টাইম কিছু কাজ করে কোনোরকমে পকেট খরচ চালায়।

এরা কিন্তু পৃথিবীর সব কিছুর খবর রাখে। এদের সব কিছুর মধ্যে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ।

সুকুমার বললো, আজ আর বসে বসে চা পেঁদিয়ে কি হবে? চল দেবকুমার। আজ একটু মাল খাওয়াবি?

রুদ্র বললো, দেবু আজ আমাদের খাওয়াবে বলেই এসেছে।

অফিসের পার্টিতে বা সহকর্মীদের বাড়িতে বাধ্য হয়ে খানিকটা পান করে বটে, কিন্তু দেবকুমার এমনিতে মদ্যপান ভালোবাসে না। সে ঠিক উপভোগ করে না। মদের দোকান মানেই তো বিরাট হৈচৈ।

দেবকুমার বললো, বোস একটু। এতদিন পর এলাম, হারুদার হাতের চা খাই আগে এক কাপ।

হারুদার যথেষ্ট বয়েস, বিশাল কালো শরীর, ওদের তুমি তুমি করে কথা বলেন।

নিজের হাতে দেবকুমারের জন্য চা এনে হারুদা বললেন, তুমি আজকাল বড় চাকরি করো শুনলাম, আমার ভাইপোটা বেকার বসে আছে, ওকে একটু ঢুকিয়ে দাও না তোমার অফিসে।

দেবকুমারের চার বন্ধু অট্টহাস্য করে উঠলো।

বিমান বললো, তুমি তো আচ্ছা লোক হারুদা! দেখছো,

আমরা চার চারটে বেকার বসে আছি, আর তুমি আগে এসেই তোমার ভাইপোর কথা তুললে ?

হারুদা বললেন, আহা আমার ভাইপোটার জন্য পিওন-টিওনের যে কোনো কাজ।

অরুণ বললো, আমি তো একটা পিওনের চাকরির ইন্টারভিউ দিয়েও পাইনি।

সুকুমার বললো, ওদের কম্পানির একটা পিওনের মাইনে এক-জন স্কুল টিচারের চেয়ে বেশী। তাছাড়া বছরে দু'বার বোনাস। পিওন বলে অমনি হেলাফেলা করছো!

হারুদা বললেন, আঃ, তোমাদের জ্বালায় কোনো একটা কথা পাড়বার উপায় নেই।

রুদ্র বললো, আজ সেই মেটুলির কারিটা বানিয়েছো নাকি, হারুদা ? দেবু এসেছে, ওকে খাইয়ে দাও! পাঁচ প্লেটই দিও!

দেবকুমার ভুল জায়গায় এসেছে। এখানে তার মন ভালো হবে না।

দেবকুমার অরুণকে জিজ্ঞেস করলো, তোর আই এ এস পরীক্ষা দেবার কথা ছিল না ?

অরুণ কায়দা করে কাঁধ ঝাঁকিয়ে এবং ঠোঁট উল্টে বললো, দিলাম না শেষ পর্যন্ত!

—কেন ?

—ইচ্ছে করলো না। দিলেও নির্ঘাত ফেল করতাম, তাই শুধু শুধু আর অপমান হয়ে লাভ কী ?

অরুণ পড়াশুনোয় যথেষ্ট ভালো ছিল। শুধু তাই নয়, তাকে একজন প্রতিভাবান বলে গণ্য করা হতো কলেজজীবনে। তার কথা-বার্তা শুনে মনে হতো, সাহিত্যে সে সাঙ্ঘাতিক কিছু একটা কাণ্ড ঘটাবে।

—তুই লিখিস এখনো ?

—কেন লিখব না ?

রুদ্র বললো, অরুণ যা লেখে, তা দেবকুমারের নিশ্চয়ই চোখে পড়ার কথা নয়। তোদের চাকরিতে কিছু পড়াশুনোর সময় থাকে?

সুকুমার বললো, ইকণমিক উইকলি নিশ্চয়ই পড়তে হয়। বাংলা পড়বার সময় পাওয়া শক্ত, তাই না রে, দেবু?

দেবকুমার উত্তর দিল না। ওরা তাকে কোণঠাসা করবার চেষ্টা করছে। যতই কাজ থাকুক, দেবকুমার দু'একটা বড় বাংলা পত্রিকায় নিয়মিত চোখ বুলোয়। অরুণ যদি লেখার জগতে সাজ্ঘাতিক কিছু করতো, তা হলে সেটা নিশ্চয়ই দেবকুমারের ঠিক নজর পড়তো।

এই চার বন্ধুই যেন আরও রোগা হয়েছে, চুপসে গেছে গাল। সামনের অ্যাশট্রে ভরে গেছে সিগারেটের টুকরোয়, চা আসছে কাপের পর কাপ। ঠিক কলেজজীবনের একই জায়গায় যেন ওরা বসে আছে।

হারুদা মেটুলির কারি দিয়ে গেলেন। একটুখানি মুখে দিয়েই দেবকুমারের একেবারে লাফিয়ে ওঠার মতন অবস্থা। অসম্ভব ঝাল!

রুদ্র বললো, খেয়ে নে! খেয়ে নে! মাল খাবার আগে পেটে একটু প্রোটিন থাকা ভালো।

সুকুমার বললো, আজ কি বাংলা খাওয়া হবে, না বিলিতি?

বিমান বললো, কী যা তা বলছিস? দেবকুমার কখনো বাংলার দোকানে ঢুকতে পারে? সেখানে হয়তো ওর অফিসের আর্দালি কিংবা গাড়ির ড্রাইভারের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।

দেবকুমার বললো, ভাই, সত্যি কথা বলছি, আজ আমার কাছে টাকা নেই। তোদের আর একদিন নিশ্চয়ই খাওয়াবো। আজ হারুদার দোকানে চা খাওয়ার জন্য এসেছিলাম, পকেটে মাত্র দশ পনেরোটা টাকা।

একটুও চমকালো না ওরা। কিংবা অবিশ্বাসও করলো না। শুধু নিছক রসিকতার ছলে রুদ্র জিজ্ঞেস করলো, তুই চটি পরে এসেছিস, না শু? এই তো শু দেখছি, তাহলে মোজার মধ্যে একশো টাকার নোট নেই একটা?

—মোজার মধ্যে ?

—আমি তো শুনেছি, যাদের অবস্থা একটু ভালো, তারা সব সময় পায়ের তলায় একটা একশো টাকার নোট রেখে দেয়। শুধু এমার্জেন্সির জন্য। ধর, রাস্তায় হঠাৎ গাড়ি খারাপ হয়ে গেল!

—আমার গাড়ি নেই।

—কিংবা কোনো কারণে তোকে পুলিশে ধরলো—আমাদের পুলিশে ধরলে কোনো ক্ষতি নেই, দু চারদিন হাজতে কাটিয়ে আসবো, কিন্তু তোদের আবার অফিসে ছুটি ফুটি নেবার ব্যাপার আছে, সেই জন্য পুলিশকে ঘুষ দেবার টাকাটা সব সময় কাছে রাখতে হয়।

—আমি জুতো মোজা খুলে দেখাবো ?

—পাগল নাকি ? তোর মুখের কথাই তো যথেষ্ট !

বিমান উঠে দাঁড়িয়ে বললো, চল, মাল খাবো যখন বলেছি, তখন আজ মাল খাবোই। আমার কাছে কিছু টাকা আছে।

সুকুমার বললো, আমার কাছেও গোটা চল্লিশেক আছে, ঠিক হয়ে যাবে।

দেবকুমার একটু অসহায়ভাবে বললো, আজ যাব না।

রুদ্র বললো, চল না, আমরা আজ তোকে খাওয়াবো। তুই এতদিন পরে এলি।

বিমান দেবকুমারের হাত ধরে টেনে তুললো। তারপর খুব মিষ্টি করে বললো, যারা বড়লোক তাদের পকেটে সব সময় বেশী টাকা থাকে না। সেটাই স্বাভাবিক। কেন না তাদের ব্যাঙ্কে টাকা রাখতে হয়, নইলে ব্যাঙ্কগুলো চলবে কী করে ? তাদের বাড়িতেও থাকে স্টিলের লকার। বড় বড় লকার কম্পানির ব্যবসাও তো চালু রাখতে হবে। আমরা ব্যাঙ্কে টাকা রাখি না। কারণ আজ জমা দিয়ে কালই নিলে ওরা রেগে যায়। বাড়িতে টাকা রাখলে ভাই বোন, এমন কি বাপ মাও মেরে দিতে পারে। সেই জন্য আমাদের পকেটই ব্যাঙ্ক, পকেটই লকার।

রুদ্র বললো, খুব ভালো জামাকাপড় পরলে পকেটমাররাও

তাদের ধার ঘেঁষে না। নিম্নমধ্যবিত্তদেরই বেশী পকেটমার হয়।

দেবকুমার বললো, আমাকে তোরা বড়লোক ভেবে ফেললি?

অরুণ বললো, টাটা বিড়লার তুলনায় তুই নেহাত চুনোপুটি কিংবা ঘুষো চিংড়ি।

সুকুমার বললো, তুই কত মাইনে পাস আমরা জিজ্ঞেস করবো না। তোদের মাইনে খুব বেশী হয় না, তাতে ট্যাকসের ঝামেলা আছে, কম্পানি পার্কস দিয়ে পুষিয়ে দেয়। কিন্তু তুই কত টাকার ইনসিওরেন্স করিয়েছিস? দু লাখ?

দেবকুমার বললো, আমাদের অফিসে কী হয় না হয়, তা তোরাই খুব ভালো জানিস দেখছি!

রুদ্র বললো, এসব কমন্ নলেজ।

সুকুমার বললো, কত টাকার ইনসিওরেন্স করিয়েছিস বল না? স্যালারি সেভিং স্কীমটা খুব চমৎকার। মাইনে থেকেই প্রতিমাসে টাকাটা কেটে নেয়, তাই গায়ে লাগে না। দু লাখ করিয়েছিস তো? দেবকুমার বললো, পাগল নাকি?

—এক লাখ? মুখ দেখেই বুঝতে পারছি, একলাখ অন্তত করা আছে। এ টাকাটাও ট্যাক্স ফ্রি। তাহলে, তোর জীবনের দাম এখন অন্তত এক লাখ। অফিসের অন্যান্য পাওনা-টাওনা বাদই দিচ্ছি। আর আমি যদি কাল মরে যাই, কেউ এক কানাকড়িও পাবে না। এবার ভেবে ছাখ, তোর জীবনের দাম এক লাখ, সারা ভারতবর্ষে এরকম লোক দু পার্সেণ্টও নেই। সুতরাং তোকে অনায়াসেই বড়লোক বলা যায়।

হারুদাকে চায়ের দামটা দেবকুমারই মিটিয়ে দিল, কিন্তু বিমান রাস্তায় বেরিয়ে ঝট্ করে একটা ট্যাক্সি ডেকে ফেললো। তার ভাব-ভঙ্গি রীতিমতন বিলাসী পুরুষের মতন। অথচ প্রাইভেট টিউশানি করে তার দুশো আড়াই শো টাকা মাত্র রোজগার।

চৌরঙ্গির একটা সস্তা বারে এসে ওরা ঢুকলো। দেবকুমারের মনের মধ্যে সর্বক্ষণ একটা কাঁটা বিঁধছে। তার মনে হচ্ছে পুরো

টাকাটাই অপচয়, ওদের এত কষ্টের উপার্জন দু' ঘণ্টার মধ্যেই একশো পাঁচ টাকা বিল হয়ে গেল।

প্রত্যেকের পকেট ঝেড়ে ঝুড়ে যা টাকা পাওয়া গেল, তাই দিয়ে বিল চুকিয়ে দিয়ে বিমান বললো, তেষ্টা রয়ে গেল, আর একটু খেলে হতো। সে গাঢ়ভাবে তাকালো দেবকুমারের দিকে।

রুদ্র বললো, আমি আমার ঘড়িটা বাঁধা দিতে পারি, তাতে যদি তোদের হয়।

অরুণ বললো, দেখি, দেখি, কী ঘড়ি? সিকো, বেশ ভালো দাম।

রুদ্র বললো, ওসব গল্পে হয়, জীবনে চলে না। বারের মালিকরা ঘড়ি জমা নেয় না।

অরুণ বললো, ঘড়ির দোকান-টোকানগুলোও বন্ধ হয়ে গেছে। তবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বেচে দেওয়া যায়। শ খানেক টাকা পাওয়া যাবে নির্ঘাত।

দেবকুমার বললো, রাস্তায় দাঁড়িয়ে? যাঃ, সে আমি পারবো না।

অরুণ বললো, হ্যাঁ, রিস্ক আছে। পুলিশ ধরতে পারে। তুই পারবি না। বিমান পারবে।

বিমান ফুরফুরে হাসিমুখে বললো, আমার ঘড়িটা একদিন এরকম ঝোঁকের মাথায় বেচে দিয়েছিলাম।

তারপরই সে দেবকুমারের কাঁধ চাপড়ে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, না, না, তোর ঘড়ি বেচতে হবে না। ঘড়ি বেচে তো সত্যিকারের নেশা-খোরেরা। তুই তো সেরকম নোস।

দেবকুমার ক্রমশ কুঁকড়ে যাচ্ছে। এরা তার পুরোনো বন্ধু। এরা বেকার, সবার চোখে এরা হেরে যাওয়া মানুষ, কিন্তু এরা প্রত্যেকটা কথায় দেবকুমারের ওপর জিতে যাচ্ছে, এদের জীবনযাত্রা কত সরল, এরা দেবকুমারের চেয়ে অনেক স্বাধীন।

রুদ্র বললো, চল, এখান থেকে উঠে পড়ি। বাংলার দোকানে গেলে আমাকে ধার দেবে, সেখানেই যাই।

দেবকুমার আবেগের সঙ্গে রুদ্রর হাত জড়িয়ে ধরে বললো, আমাকে

তোরা দল থেকে বাদ দিসনি। আমি হারুদার দোকানে এখন থেকে আবার প্রায়ই আসবো।

রুদ্র ওর এই আবেগকে কিছুমাত্র গুরুত্ব না দিয়ে বললো, যে-কোনো দিন আসতে পারিস, আমরা রোজ থাকি।

বিমান তাড়া দিয়ে বললো, চল, চল, ওখানে আবার বন্ধ হয়ে যাবে। আচ্ছা দেবু—

দেবকুমার বেশী পান করেনি, কিন্তু মুখে গন্ধ আছে বলে সে মিনিবাসে উঠলো না। হাঁটতে লাগলো।

বেশ কিছুক্ষণ পর হঠাৎ দেবকুমার খেয়াল করলো, তার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। সে রীতিমতন চমকে উঠলো। কত বছর, অন্তত আট দশ বছর হবেই তো, সে কাঁদেনি! কেনই বা কাঁদবে, সে পুরুষ মানুষ! অথচ আজ সম্পূর্ণ বিনা কারণে, একলা একলা পথ চলবার সময় সে কাঁদছে কেন?

একা থাকলেও মানুষ নিজের কাছে লজ্জা পায়। রুমাল দিয়ে ভালো করে মুখ মুছে দেবকুমার একটা সিগারেট ধরালো।

বাড়ি ফিরে দেখলো, বুনবুন ঘুমিয়েছে, খাবার ঘরে বসে অনুরাধা একটা ইংরেজি উপন্যাস পড়ছে। চোখ তুলে অনুরাধা বললো, তোমার অফিসের বাসু নাগরাজন এসেছিল তোমার খোঁজ করতে।

দেবকুমার বললো, বিশেষ কিছু খবর নেই তো?

—না, এমনি খোঁজ করতে এসেছিল, তুমি অফিস যাওনি।

—চুলোয় যাক্।

বইটা মুড়ে রেখে অনুরাধা উঠে এসে বললো, তোমার মনটা খুব খারাপ, তাই না?

দেবকুমার কথা না বলে অনুরাধার সুন্দর মুখখানি দেখতে লাগলো একদৃষ্টে। এই সুন্দর রূপ এখনো পুরনো হয়নি।

—আমিই সব কিছুর জন্য দায়ী।

দেবকুমার অনুরাধার দু' কাঁধের ওপর হাত রেখে জিজ্ঞেস করলো, কেন?

—আমি না থাকলে কোনো ঝঞ্ঝাটই হত না। তুমি যদি তোমার বাবা মায়ের পছন্দ মতন কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে।

—চুপ, ওসব কথা বলো না। আমার জীবনটা কীভাবে চলবে সেটা আমি ঠিক করবো। আমার বাবা মা নয়।

—তুমি রেগে যাচ্ছো কেন? বসো। তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি, তোমার মনের মধ্যে দারুণ যুদ্ধ চলছে। বেশী খাওনি তো?

—না। পুরোনো কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। ওরা জোর করে খাওয়ালো।

—আশ্চর্য ব্যাপার। আমি যে উপন্যাসটা পড়ছি, তাতে আছে, এর যে প্রধান চরিত্র, মানে নায়ক, সে একটা দারুণ গণ্ডগোলে জড়িয়ে পড়েছে, একটা পলিটিক্যাল জটিল অবস্থা, একটু এদিক ওদিক হলেই অনেক কিছু ঘটে যাবে, সেই সময় নায়কটি হঠাৎ সবাইকে ছেড়ে—

দেবকুমার হাই তুললো।

—শোনো না। নায়ক কারুকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়লো, সত্তর মাইল দূরে একটা স্কুল, রাত্তিরবেলা, সেখানে কেউ নেই, নায়ক গাড়ি থেকে নেমে সেই স্কুলের মাঠে বেড়াতে লাগলো, অর্থাৎ সে তার কৈশোরে ফিরে যেতে চায়, যখন কোনো সমস্যা ছিল না জীবনে ......অনেকটা ঠিক তোমার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে না? পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়ে ভালো লাগলো?

—না।

—গ্যাখো, ব্যাপারটা খুব ডেলিকেট। খুন সাবধানে এটা হ্যাণ্ডল করতে হবে।

—কোন ব্যাপারটা?

—তোমাব বাবা মায়ের ব্যাপার। ওঁদের নিশ্চয়ই বস্তিতে থাকতে দেওয়া যায় না। কিন্তু তোমার বাবার আত্মসম্মানে যেন ঘা না লাগে সেটাও দেখতে হবে।

—আমার বাবা মা বস্তিতে থাকলেই বা ক্ষতি কী আছে? ধরো, আমার ছাত্র বয়েসে আমার যখন খুব অসুখ করেছিল, বাবা বহু টাকা

খরচ করে আমার চিকিৎসা করালেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি আমি মরে যেতাম? তা হলে তো ব্যাপারটা একই দাঁড়াতো।

অনুরাধা খুব কোমলভাবে বললো, ওরকমভাবে কথা বলো না। এসব রাগের কথা। জানি, এ রাগটা আমার ওপর। সেই জন্যই তো বলছিলাম, আমি চলে গেলেই সব সমস্যা মিটে যায়।

—তুমি কোথায় যাবে?

আরও কিছু বলতে গিয়ে দেবকুমার থেমে গেল। খানিকটা মদ্য পান করার ফলে জিভ এখন চট্ করে আলগা হতে চাইবে, কিন্তু দেবকুমার নিজেকেও অতটা প্রশ্রয় দিতে চায় না।

সে অনুরাধাকে জড়িয়ে ধরে, কিছুটা নেশা হয়েছে বলেই বেশী উচ্ছ্বাসের সঙ্গে, অনেকটা ভয় পাওয়া শিশুর মতন বললো, না, প্লীজ, তুমি চলে যাবার কথা বলো না। তুমি জানো, তোমাকে আমি কতখানি···

অনুরাধা বুঝলো দেবকুমারের এই রকম উচ্ছ্বাসের কারণ। অনুরাধা যদি সত্যি সত্যি এখান থেকে চলে যায় এবং দেবকুমারের সঙ্গে তার বাবা মায়ের আবার মিলন হয়, তাহলে এই কথাই প্রমাণ হয়ে যাবে যে দেবকুমার নিছক নিজের বউয়ের প্ররোচনাতেই এক সময় বাবা মাকে ছেড়ে অন্য বাড়ি নিয়েছিল। এখন স্ত্রী ছেড়ে গেছে বলে সে আবার সুবোধ ছেলের মতন বাবা মায়ের কাছে ফিরে আসছে। একজন আধুনিক পুরুষের পক্ষে এটা মোটেই সম্মানের ব্যাপার নয়।

এসব বুঝেও, অনুরাধা তার স্বামীর ওপর ভারী একটা মায়া বোধ করলো। দেবকুমার এখন যেন বিভ্রান্ত, অসহায়, এই সময়ই তার একজন মানসিক সঙ্গীর খুব দরকার। এই দেবকুমার, যে একদিন তাকে বিয়ে করবার জন্য পাগল হয়েছিল। অনুরাধাও ঠিক করেছিল, তার বাবা মা যদি বিয়েতে রাজি না হন, তা হলে সে দেবকুমারের সঙ্গে পালিয়ে যাবে। সেই ভালোবাসা তো একটুও মরেনি। তার ইচ্ছে করছে দেবকুমারকে আদরে ভরিয়ে দিতে।

সে দেবকুমারেরর জামার বোতাম খুলে দিতে দিতে বললো, ওঠো

লক্ষ্মীটি, জামা-কাপড় ছেড়ে নাও। তোমায় খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। চট্ করে খেয়ে শুয়ে পড়ো বরং।

দেবকুমার ছু' হাত দিয়ে অনুরাধাকে টেনে নিল বুকের ওপর। দীর্ঘস্থায়ী চুম্বনের পর কোনোরকমে নিজেকে মুক্ত করে অনুরাধা বললো, আলো!

দেবকুমার পেছন দিকে লম্বা হাত বাড়িয়ে অফ্ করে দিল সুইচটা তারপর সোফার সংক্ষিপ্ত পরিসরে ছু'জনে এঁটে গেল চমৎকারভাবে। তারপর মানুষের অন্তরঙ্গতা কতদূর যেতে পারে, তারই যেন পরীক্ষা শুরু করলো ছু'জনে। দেবকুমার এমন গভীরভাবে মগ্ন হয়নি বহু-দিন। সারা শরীরে কী উদ্দাম চাঞ্চল্য, এখন পৃথিবীর আর সব কিছু তুচ্ছ।

সে অনুরাধার কানে অনবরত বলতে লাগলো, মণি, মণি, তোমার জন্যই তো আমার সব!

সব শেষ হবার পর, অন্ধকারে ওরা কিছুক্ষণ শুয়ে রইলো চুপচাপ। মধুর আমেজটা খানিক বাদে মিলিয়ে যাবার পর আবার যখন অন্যান্য চিন্তা মাথার মধ্যে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়তে চাইছে, সেই সময় দেব-কুমার আলো জ্বেলে দিল।

এরপর খাওয়া-দাওয়ার পর্বটা চুকলো খুব সংক্ষিপ্তভাবে। দেব-কুমার ছুটো সিগারেট শেষ করার মধ্যেই অনুরাধা তৈরি হয়ে নিল শুয়ে পড়ার জন্য। চুল আঁচড়ানো এবং মুখে ক্রিম মাখার ব্যাপারটা সে খুব তাড়াতাড়ি সেরে নেয়।

বুনবুন ঘুমের মধ্যে সারা খাটে চরকি দেয়, একদিন খাট থেকে পড়েও গিয়েছিল, সেই জন্য তাকে মাঝখানে শুইয়ে ছু'দিকে ছুটো পাশ বালিশ দিয়ে রাখতে হয়। দেবকুমার ও অনুরাধা শোয় তার ছু' পাশে। ঘুমন্ত বুনবুনের শরীরের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দেবকুমার ছুঁয়ে থাকে অনুরাধাকে।

অনুরাধা ফিসফিস করে বললো, আমাদের এই ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দেওয়া উচিত।

—কেন ?

—এখানে সকলের জায়গা হবে না। আর একটু দূরে, ধরো টালিগঞ্জ বা যাদবপুরের দিকে একটা বড় দেখে ফ্ল্যাট আমরা নিতে পারি। ভাড়া বেশী হবে, তুমি বলবে, তোমার অফিস থেকে ভাড়া দিচ্ছে। তোমার বাবা এখন একশো পাঁচ টাকা ভাড়া দিচ্ছেন, সেটা তাঁর কাছ থেকে নেবে। আর যেটুকু টানাটানি হবে, সেটা আমি কষ্ট করে পুষিয়ে নেবো। বুনবুন বড় হয়ে গেছে, এখন আমি অনায়াসে একটা চাকরি করতে পারি। অন্তত কোনো স্কুলে।

—আবার আমরা এক সঙ্গে থাকবো।

—হ্যাঁ।

—তুমি পারবে ?

—নিশ্চয়ই পারবো।

দেবকুমার ছোট করে হাসলো। অনুরাধার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো, মণি, আমার চেয়ে তুমিই বেশী চিন্তিত দেখছি। কিন্তু তুমি এরকম চাইছো কেন ? আমার বাবা মা বস্তিতে থাকলে তোমার বাপের বাড়ির লোকেরা নিন্দে করবে, এই জন্য ?

—হ্যাঁ, সেটাও একটা কারণ। আমার বাবা মা সব দোষটা আমার ঘাড়ে চাপাবেন। শুধু আমার বাবা মা কেন, বন্ধু বান্ধব, তোমার অফিসের লোকজন সবাই নানারকম কথা বলবে। বাবা যখন জেদ ধরেছেন।

বিয়ের পর মেয়েদের দুটি করে মা এবং দুটি করে বাবা হয়ে যায় বলে কথাবার্তার সময় ঠিক বোঝা যায় না, কার বাবার কথা বলা হচ্ছে।

—কার বাবা ?

—তোমার বাবা। বোঝাই যাচ্ছে, উনি আমাদের সবাইকে জব্দ করতে চান, তাই আগে থেকে কারুকে কিছু জানাননি। কিন্তু আমরাই বা ওঁর কাছে জব্দ হবো কেন ? আমরা আবার ওঁকে জোর করে ফিরিয়ে আনবো। শোনো, বস্তিতে থাকার ব্যাপারে আমার

কোনো স্ববারি নেই, লোকে কী বলে না বলে তাতে আমার কিচ্ছু যায় আসে না। আমি কোনোদিন কারুর কথা গ্রাহ্য করিনি। আমি চাই মানুষ স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছে মতন জীবন কাটাবে। তোমার বাবা যদি শখ করে বস্তিতে থাকতে চাইতেন, তাতে আমি মোটেই আপত্তি করতুম না। আমি রোজ ওঁর সঙ্গে বস্তিতে গিয়ে দেখা করে আসতুম। কিন্তু উনি জোর করে মাকে, জাপানী-টোটোকে ওখানে থাকতে বাধ্য করছেন কেন? যখন অন্য উপায় আছে। উনি যদি অন্যদের জব্দ করতে চান, তাহলে আমরাই বা ওঁকে ছাড়বো কেন?

দেবকুমারকে যেন আজ হাসিতে পেয়েছে। সে বেশ উপভোগের সঙ্গে ফুলে ফুলে হাসতে লাগলো।

—তুমি হাসছো?

—মণি তোমার উদ্দেশ্য খুব মহৎ। তুমি সেন্টিমেন্ট দেখাতে চাও না বলে সোজাসুজি বলবে না, আসলে তুমি চাও, শাশুড়িদের সাহায্য করতে। তাঁদের আবার ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু তুমি একটা জিনিস শুধু বুঝে দেখোনি। বাবা রাজি হবেন কিনা। আমি আমার বাবাকে তো চিনি। উনি কিছুতেই রাজি হবেন না। কিছুতেই না।

—তাহলে ওঁর জেদ নিয়ে উনি একা থাকুন। অন্য সবাইকে নিয়ে আসবো আমরা।

—এবার প্রশ্ন, বাবাকে ছেড়ে আসতে মা রাজি হবেন কি না। মায়ের পক্ষে সেটা স্বার্থপরতা হবে না? মাও যদি আসতে না চান, তাহলে কি তুমি বলবে জাপানী-টোটোকে নিয়ে আসতে?

আলোচনা আর বেশি দূর এগোল না। একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়লো অনুরাধা।

কিন্তু দেবকুমারের ঘুম এলো না। বাড়ি ফেরার পথে রাস্তায় সে একা একা কাঁদছিল। একটু আগেই হাসছিল অনুরাধার কথা শুনে। কোনোটাই স্বাভাবিক নয়। মনের এরকম প্রচণ্ড আলোড়ন থাকলে ঘুম আসবে কী করে।

সে উঠে গিয়ে ঘাড়ে একটু জল দিল। সিগারেট ধরালো আর একটা। তারপর পাশের ঘরে গিয়ে টেবল ল্যাম্প জ্বেলে কলম খুলে লিখতে বসলো।

দেবকুমারের চিঠি :

বাবা,

অনেক দিন পর আপনাকে আমি চিঠি লিখছি। যতদূর মনে পড়ে, এর আগে আমি আপনাকে দুটো চিঠি লিখেছি। একটা আমার তেরো-চোদ্দ বছর বয়সে, একদিন আপনি আমাকে ভুল কারণে খুব মেরেছিলেন বলে আমি আসল কারণটা জানিয়েছিলাম। আর একবার লিখেছিলাম আমার বিয়ের আগে, অনুরাধার সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যাপারে আপনি আপত্তি তুলেছিলেন বলে। ছেলে-বেলা থেকেই আপনার সামনাসামনি দাঁড়িয়ে আমার বক্তব্য ঠিক মুখে প্রকাশ করতে পারি না।

আমাদের এতদিনকার পুরোনো ভাড়া বাড়ি আপনি এক কথায় ছেড়ে দিলেন জেদ না অভিমান না রাগ, কিসের বশে তা আমি ঠিক জানি না। যদিও বাড়ি ছাড়বার কোনো প্রয়োজন ছিল না। হাই-কোর্টে মামলার শেষ পর্যায়ে কিছুদিন আপনি অসুস্থ ছিলেন, তখন ছেলে হিসেবে আমাদের উপস্থিত থাকা উচিত ছিল। মায়ের কাছে শুনেছি, আমি উপস্থিত থাকতে পারিনি বলে আপনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন যে, ও বাড়ি থাকলো না গেল, তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। আমাকে তখন অফিসের জরুরী কাজে বাইরে যেতে হয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম টোটো যাবে। টোটোর এখন একুশ বছর বয়েস হয়েছে, সে অনেক কিছুই বোঝে, সুতরাং তার ওপর নির্ভর না করার কোনো কারণ নেই। আমি টোটোকে সেই মর্মে বলেও গিয়েছিলাম বারবার। কিন্তু টোটো যায়নি। আপনি ভাবতে পারেন যে টোটোর ওপর কাজটা চাপিয়ে আমি দায়িত্ব এড়িয়েছি কিন্তু আমরা যে-ধরনের অফিসে কাজ করি, সেখানে জরুরী কাজ পড়লে আর সব কিছু ফেলে সেই কাজে যেতেই হবে। নইলে

কম্পানি কক্ষনো ক্ষমা করে না। আমার সহকর্মী নাগরাজনের স্ত্রীর বাচ্চা হবার সময় সে কাছে থাকতে পারেনি। কম্পানির কর্তারা বলেছিল, নার্সিংহোম ঠিক করা আছে, সেখানে তার স্ত্রী যাবে, ভালো ভালো ডাক্তাররা দেখাশুনো করবে, নাগরাজনের উপস্থিত থাকার তো কোনো দরকার নেই। সেবার নাগরাজনের প্রথম সন্তানটি মারা যায়। অবশ্য, নাগরাজন উপস্থিত থাকলেও বাচ্চাটি মারা যেতে পারতো, আমরা সবাই নাগরাজনকে এই কথাই বুঝিয়েছি।

বাড়ি বদলাবার সময় একটা খাতা, যাতে আপনি ডায়েরির মতন কিছু কিছু লিখেছেন সেটা অনুরাধার চোখে পড়ে। সেই খাতাটা অনুরাধা নিয়ে এসেছিল, পরদিনই আবার নতুন বাড়িতে রেখে এসেছে। আপনার ডায়েরি পড়া আমাদের পক্ষে খুবই অন্যায়, সে জন্য আপনার পায়ে ধরে আমি ও অনুরাধা ক্ষমা চাইছি। অনুরাধার কৌতূহল বেশী, পাতা উল্টে কয়েক জায়গায় আমাদের উল্লেখ দেখেই সে খাতাটি নিয়ে এসেছিল।

বাবা, আমি যখন স্কুল ফাইন্যাল পাস করি, তখন আমি ঠিক করেছিলাম রাত্রের কলেজে কমার্স পড়বো আর দিনের বেলা একটা চাকরির চেষ্টা করবো। স্কুল ফাইন্যালে আমার রেজাল্ট ভালো ছিল, একটা যা-হোক চাকরি আমি পেয়ে যেতে পারতাম তা হলে নিজের পড়ার খরচ চালিয়ে নিয়ে আমি সংসারেও সাহায্য করতে পারতাম কিছুটা। কিন্তু আপনি রাজি হন নি। আপনি বলেছিলেন, সাধাবণ ছাত্ররা ওরকমভাবে পড়াশুনো চালাতে পারে, কিন্তু ভালো ছাত্রদের ওতে ক্ষতি হয়। স্কুলে ভালো রেজাল্ট করা সহজ, কিন্তু কলেজে এসেই ছাত্রদের আসল মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। আপনি বলে-ছিলেন, আমায় সংসারের কথা কিছু চিন্তা করতে হবে না, আমি যেন শুধু পড়াশুনোয় মন দিয়ে থাকি।

আপনি আমায় যে কলেজে ভর্তি করেছিলেন, সেখানে প্রায় অধিকাংশই ধনী পরিবারের ছেলেরা পড়ে। তাদের সত্যিই চিন্তা করতে হয় না সংসারের কথা। কিন্তু আমি তো চোখ বুজে থাকতে

পারতাম না। আমি গোপনে একটি টিউশানি নিয়েছিলাম, সে কথাও জানতে পেরে আপনি বকে আমাকে ছাড়িয়ে দিলেন। আসলে আপনি তখন ত্যাগের নেশায় মেতে উঠেছিলেন, আপনি আত্মত্যাগ করে ছেলের উন্নতির চেষ্টা করছেন, লোকে আপনাকে ধন্য ধন্য করছে এই ব্যাপারটা আপনি উপভোগ করতেন।

(একটুক্ষণ থেমে আঙুল দিয়ে মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে এবং ভ্রূ কুঁচকে তাকাবার পর, দেবকুমার শেষ বাক্যটি কেটে দিল। বার বার এমনভাবে কলম ঘষতে লাগলো যাতে কিছুতেই আর বোঝা না যায়।)

বি এ পরীক্ষার বছরে আমার কঠিন অসুখ হয়। সেই অসুখের কষ্টের মধ্যে আমার প্রধান কষ্ট ছিল এই ভেবে যে আমার জন্য প্রচুর টাকা-পয়সা খরচ হয়ে যাচ্ছে। আপনি পাগলের মতন কলকাতার সব বড় বড় ডাক্তারদের ডেকে এনেছিলেন। ইস্কুল মাস্টারের ছেলেকেও বড় ডাক্তাররা বিনা পয়সায় দেখেন না। ডাক্তাররা বলেছিলেন, আমার রিউম্যাটিক হার্ট, সারবার আশা খুব কম। তিন মাস বিছানায় পড়ে থেকে আমি আপনাকে, সর্বস্বান্ত করে দিয়েছি। সেরে উঠবার পর, সেই দুর্বল শরীরেও আমি গোপনে রাত জেগে জেগে সাঙ্ঘাতিকভাবে পড়েছি, যাতে আমার রেজাল্ট খারাপ না হয়। সে শুধু আপনাকে খুশী করবার জন্য। যাতে আমি আপনার আত্মত্যাগের মূল্য দিতে পারি।

পাস করবার পর সেবার আমি গোঁ ধরেছিলাম, আর কিছুতেই পড়বো না। আমার একটা মোটামুটি চাকরি পাবার যথেষ্ট যোগ্যতা জন্মে গেছে. আর পড়াশুনা করার কোনো মানে হয় না। আপনি সারা দিনরাত হাড় ভাঙা খাটুনি খাটছেন, আমি তখন একটা চাকরি করলে আপনাকে খানিকটা বিশ্রাম দিতে পারতাম। কিন্তু আপনি আমাকে নিয়ে গিয়ে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করে দিয়ে এলেন। এম এ পাস আমাকে করতেই হবে। আমাকে জীবনে বড় হতেই হবে। বড় হওয়া মানে বড় চাকরি পাওয়া।

বি এ পরীক্ষার পরে কয়েকমাস ছুটিতে গড়পাড়ের একটা স্কুলে কিছুদিন আমার একদা মাস্টারি জুটেছিল, অনয়াসে কয়েক মাস সেটা করতে পারতাম। কিন্তু আপনি সে কথা শুনে বললেন, মাস্টারিতে একবার ঢুকলে আর রক্ষে নেই। খবরদার, ও কাজও করিস না। যদি আর কিছু না পাস, তাহলে কালীঘাটের মন্দিরে লোকের জুতো পাহারা দিয়ে যা পাস রোজগার করবি, তবু যেন জীবনে কখনো তোকে মাস্টারি করতে না হয়।

সেই প্রথম বুঝলাম মাস্টারির ওপর আপনার কী তীব্র ঘৃণা। অথচ সারাজীবন আপনাকে ঐ মাস্টারিই করে যেতে হলো। এর থেকে বড় ট্র্যাজেডি আর কী। মায়েরও দেখেছি, সেই রকমই অভিমত। কোনো ইস্কুল মাস্টারই চান না, তাঁর ছেলে স্কুল মাস্টার হোক।

অথচ, আমার সত্যিকারের ইচ্ছেছিল, মাস্টারি না হোক, এম এ পাস করে অধ্যাপনা করার। আমি খুব বেশী উচ্চাকাঙ্ক্ষী নই, নিরিবিলিতে জীবন কাটাতেই চেয়েছিলাম। আপনিই চেয়েছিলেন, আমি যেন কোনো বড় চাকরিতে ঢুকি। যাতে সবাই বলে, অমুক বাবুর ছেলে জীবনে কতটা উন্নতি করেছে। আপনার স্কুল কমিটির সেক্রেটারিই আমাকে এই চাকরিতে ঢুকিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। আমি তখন গভর্নমেন্টের কম্পিটিটিভ পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম। কিন্তু সেক্রেটারি বললেন. সরকারী চাকরির ভবিষ্যৎ নেই, তার চেয়ে বড় কোনো কমার্শিয়াল ফার্মের চাকরি অনেক ভালো, ট্যুরে প্রচুর পয়সা দেয়, তাছাড়া অনেক রকম সুযোগ সুবিধে। স্কুলের সেক্রেটারির উপদেশ আপনার কাছে মহামূল্যবান, সেই জন্য আপনিও আমাকে আদেশ দিলেন সেই চাকরিতে ঢুকে পড়ার। গোড়া থেকেই মাইনে খুবই ভালো।

অর্থাৎ, বাবা, আপনি এবং আপনারাই ঠিক করেছেন, আমার জীবনে কী করা উচিত, না উচিত। আমার মতামতের কোনো মূল্যই দেননি। আমি যদি গোড়া থেকেই বিদ্রোহ করতাম তাতেও আপনি

মনে আঘাত পেতেন। টোটোর ব্যাপারে যেমন পেয়েছেন। টোটো আমার চেয়ে অনেক বেশী তেজী, তাই সে তার যা ইচ্ছে করছে।

যে অফিসে আপনারা আমাকে ধরে বেঁধে ঢুকিয়ে দিলেন, আমাকে তো সেই অফিসের উপযুক্ত হয়ে উঠতে হবে। নইলে, দু'চার মাস বাদেই আমি সেখানে অযোগ্য প্রমাণিত হয়ে বরখাস্ত হতুন, তাহলে আপনারা দুঃখিত হতেন না? আপনার স্কুলের সেক্রেটারির মান নষ্ট হতো না?

এই সব বড় বড় কমার্শিয়াল ফার্মের অফিসার শ্রেণীর লোকেরা সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের প্রাণী। এদের বলে জেট সেট পীপ্‌ল। সাহেবদের অনুকরণ করা এক ধরনের ভাঁড়। এরা ট্র্যাংকুইলাইজার খেয়ে ঘুমোয়, আবার ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে জাগে। সারাদিন পাগলের মতন কাজ করে, সন্ধ্যেবেলা থেকে ফুর্তি শুরু হয়, সেই ফুর্তির ধরন সব জায়গায় এক। দারুণ গ্রীষ্মেও এরা টাই পরে, প্যান্টের সঙ্গে চটি পরে অফিস যাবার কথা এরা কেউ ভাবতেই পারে না। এরা যেহেতু আলাদা একটা শ্রেণী, তাই এরা সব সময় কাছাকাছি থাকে, সহকর্মীদের মধ্যে সোসালাইজ করা এখানে একটা কর্তব্যের মধ্যে ধরা হয়। এই জীবনে বুড়ো বাপ মায়ের স্থান নেই। এটা নিষ্ঠুর মনে হতে পারে, কিন্তু এটাই সত্য, শুধু শুধু চাপ দেবার কোনো মানে হয় না। সহকর্মীরা বাড়িতে এলে সেখানে মায়ের বাঙাল কথা মানায় না, বাবা এসে বন্ধুদের মাঝখানে বসে থাকা কিংবা ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় তাঁর গলা খাঁকারি দেওয়া মানায় না। রাত্তির সাড়ে বারোটা একটা পর্যন্ত পানাহার চলে, তারপর রেকর্ডে উচ্চগ্রামে ইংরেজি বাজনা. বৌরা অন্য পুরুষদের সঙ্গে নাচে, অন্য সহকর্মীদের বাড়ির পার্টিতে যদি এরকম চলে, তবে আমার বাড়িতেও মাঝে মাঝে এরকম করতেই হবে। এটাই নিয়ম।

সব অফিসারই নৃশংস, নিষ্ঠুর আর ভোগপরায়ণ নয়। বাবা মায়ের প্রতি কর্তব্যবোধ অনেকেরই আছে। নিজেরা আলাদা বাড়িতে থাকে, বাবা মাকে নিয়মিত টাকা দিয়ে সাহায্য করে। সেটাই

সুবিধেজনক, তাতে কারুর রুচিবোধে আঘাত লাগে না, সবাই নিজের নিজের মতন চলতে পারে।

আমাদের অফিসেই আছে বীরেন্দ্রপ্রতাপ সিং, ভারী চমৎকার ছেলে, আপনি দেখেছেন তাকে, আপনার সঙ্গে দেখা হলেই ও পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছে। ওর বাবা বিহারের একজন বর্ধিষ্ণু চাষী। এক পুরুষে এতখানি লেখাপড়া শেখার উদাহরণ সহজে দেখা যায় না। বীরেন্দ্রপ্রতাপ খুব উন্নতি করবে। ওর বাবা এখনো ঠেঙো ধুতি আর ফতুয়া পরেন, মাথায় পাগড়ি, পায়ে কাঁচা চামড়ার নাগরা। ওর মা এতখানি ঘোমটায় মুখ ঢেকে থাকেন যে মুখই দেখা যায় না। দুজনেরই এখন যথেষ্ট বয়েস। বীরেন্দ্রপ্রতাপ তো কলকাতায়, তার ফ্ল্যাটে বুড়ো বাবা মাকে এনে রাখেনি, তাঁরা গ্রামেই থাকেন, বীরেন্দ্র টাকা পাঠান। বড় জোর বছরে একবার তারা কলকাতায় বেড়াতে এলে বীরেন্দ্র ছুটি নিয়ে তাঁদের চিড়িয়াখানা, ভিকটোরিয়া দেখিয়ে দেন।

সেই জন্য, আমিও ভেবেছিলাম. আমার চাকরির দিকটা ঠিকঠাক বজায় রাখতে গেলে আমাদের পক্ষে আলদা ফ্ল্যাটে থাকাই ভালো। আমি যথাসম্ভব আপনাকে সাহায্য করবো। প্রায়ই দেখাশুনো হবে। তাহলে, আমার ফ্ল্যাটে অফিসের বন্ধুদের ডেকে পার্টি দিতে কোনো অসুবিধে হবে না। আপনাকেও দেখতে হবে না যে ছেলের বন্ধুরা পাশের ঘরে বসে মদ খেতে খেতে বিলিতি বাজনা শুনছে। এটা আমি নিজে সবচেয়ে ভালো বন্দোবস্ত ভেবেই করেছি। অনুরাধার কথা শুনে নয়।

অথচ, আপনি আমাদের এই অন্য ফ্ল্যাটে চলে আসাতেই এত আঘাত পেলেন? আপনি পুরোনো মূল্যবোধ সব আঁকড়ে থাকতে চান, অথচ পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন ব্যবসায়ীদের জগতে ছেলেকে পাঠাবেন জীবিকার জন্য। দুটোকে মেলানো যে আর কিছুতেই সম্ভব নয়।

আপনার ডায়েরী না পড়লে বুঝতেই পারতাম না যে আপনি সেদিন আপনার তেল মাখা অবস্থায় বুনবুনকে আদর করার ব্যাপারটা

এত গুরুত্ব দিয়েছেন। আমি সেদিন আপনার সঙ্গে রূঢ়ভাবে কথা বলেছি ? আমার পক্ষে আপনার সঙ্গে রূঢ় কথা বলা কিছুতেই সম্ভব নয়। আপনি আগে থেকেই আমার ওপর বিরক্ত হয়ে ছিলেন বলেই হয়তো আমার কথা আপনার কানে রূঢ় শুনিয়েছে।

আমি নিজের ইচ্ছে মতন প্রথম যে কাজটি করেছি, সেটি হচ্ছে, আমার বিয়ে। আপনি সম্বন্ধ করে, জাত গোত্র মিলিয়ে বিবাহ দেওয়ায় বিশ্বাসী। অথচ আপনি ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন। এই সব জাতি গোত্রের ব্যাপারগুলি যে কত দূর ভুয়ো, ইতিহাসে তার বহু প্রমাণ ছড়ানো আছে। যাই হোক, আপনার সঙ্গে এবিষয়ে তর্কে যাবো না। কিন্তু আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে, মানুষের পরিচয় তার জাতি, গোত্র দিয়ে হয় না। বিয়েটা সারা জীবনের ব্যাপার আমি মনে করি, পুরুষ-মানুষের নিজের জীবনসঙ্গিনী নিজেরই বেছে নেওয়া উচিত। মেয়েদের সম্পর্কেও ঐ একই কথা খাটে। আপনাদের সময়ের চেয়ে আমাদের সময়ের চিন্তা-ভাবনা অনেক বদলে গেছে। নিজের নির্বাচন করা পাত্রীকে বিয়ে করেও যদি কোনো মানুষ জীবনে অসুখী হয়, তবুও সে জানবে যে এর সম্পূর্ণ দায়িত্ব তার নিজের, তার বাবা মায়ের নয়।

অনুরাধা তো আমাদের বাড়িতে যথেষ্টই মানিয়ে নিয়েছিল। সে মাকে রান্নাঘরে সাহায্য করেছে, জাপানী আর টোটোকে পড়িয়েছে, আর সাধ্যমতন আপনারও সেবা করেছে। তার একটি মাত্র দোষ আপনাদের চোখে লাগতে পারে সে অত্যন্ত বেশী স্বাধীনচেতা। অন্যের জন্য সে যথাসাধ্য সেবাযত্ন করবে কিন্তু নিজের ইচ্ছেগুলিকেও চেপে রাখবে না। আমার স্ত্রীর গুণপনার ফিরিস্তি আমি দিচ্ছি না, আমি নির্লিপ্তভাবে ব্যাপারটি দেখবার চেষ্টা করছি। সে যে আমার অফিসের বন্ধুদের সঙ্গে নাচে, তার কারণ সেটাকে সে অন্যায় মনে করে না। আমিও মনে করি না।

বুনবুন জন্মাবার পর কয়েকটি সমস্যা দেখা দিয়েছিল। আগেকার দিনে একভাবে বাচ্চাদের মানুষ করা হতো, এখন অন্যভাবে হয়। বিজ্ঞানই বলুন অথবা বাণিজ্যিক জগৎই বলুন, ঘন ঘন মানুষের আচার

আচরণ বদলে দেয়। আমার ঠাকুর্দা কোনোদিন জুতো পায়ে দেননি, তাঁরা ছিলেন গ্রামীণ সভ্যতার মানুষ। তা বলে আমার বা আপনার পক্ষে কি এখন একদিনও খালি পায়ে রাস্তায় হাঁটা সম্ভব? অশৌচের সময়ও লোকে আজকাল রবারের চটি পায়ে দেয়। আমার এক ডাক্তার বন্ধু সেদিন বললেন, গ্রামের প্রত্যেকটি চাষী যতদিন জুতো পায়ে না দেবে, ততদিন তাদের স্বাস্থ্য ভালো হবে না। খালি পায়ে হাঁটার জন্যই তাদের পেটে হুকওয়ার্ম হয়, যেগুলো পা দিয়ে ঢোকে।

যাই হোক খুব অল্প বয়স্ক শিশুদের মুখে মুখ দিয়ে আদর করা যে একটি অস্বাস্থ্যকর অভ্যেস, সেটা বহু ডাক্তারি বইতেই আছে। বুন-বুনকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবার জন্য অনুরাধার চেষ্টার অন্ত ছিল না। খানিকটা বাতিকও জন্মে গিয়েছিল, প্রত্যেক মায়েরই এরকম কিছু কিছু বাতিক থাকে। আপনি বুনবুনকে ঠোঁটে চুমু খেতেন বলে সে শিউরে উঠতো। আমি তাকে বলতাম, আমার বাবা মাও তো এতগুলো বাচ্চাকে মানুষ করেছেন, ওঁরা কি স্বাস্থ্যের নিয়ম জানেন না? তখন সে পৃথিবী-বিখ্যাত শিশু বিশেষজ্ঞদের বই খুলে আমাকে দেখিয়েছে যে ঐ অভ্যেসটা কত খারাপ। আগে আমাদের কিছু হয়নি বলেই যে একটা অস্বাস্থ্যকর ব্যাপার চালিয়ে যেতে হবে, তার কোনো মানে আছে?

মাকে দিয়ে এই ব্যাপারটা আপনাকে দু একবার আভাসে জানানো হয়েছিল, কিন্তু আপনার মনে থাকতো না। অনুরাধা ঐ ব্যাপারটা দেখলেই খুব ছটফট করতো। আর আমি পড়েছিলাম দোটানায়। আপনি নাতনীকে আদর করবেন, সেটা আমি নিষেধ করতে পারি না, আবার একটা অবৈজ্ঞানিক অস্বাস্থ্যকর ব্যাপারও জেনে শুনে সমর্থন করতে পারি না। বিশেষত আবার গায়ে তেল মেখে একটা বাচ্চাকে ধরা! অনুরাধা আমাকে বলেছিল, ছাখো, তোমার বাবাকে আমার কিছু বলা উচিত হবে না। আমি পরের বাড়ির মেয়ে এসে ওঁকে উপদেশ দিচ্ছি ভেবে উনি দুঃখ পাবেন। তুমি বরং একটু বুঝিয়ে বলো। সেই জন্যই আমি আপনাকে শুধু বলতে গিয়েছিলাম, বুন-

বুনের ঠোঁটে চুমু খাবেন না। আপনি সবটা না শুনেই হঠাৎ রেগে উঠলেন, আমার আর কোনো কথাই শুনলেন না। অথচ, ব্যাপারটা কত সামান্য, ঠোঁটের বদলে বুনবুনের গালে চুমু খেলেও···আসলে, বিস্ফোরণের বারুদ অনেক দিন থেকেই নিশ্চয় জমে ছিল আপনার মনের মধ্যে। অনুরাধার সঙ্গে আমার অসবর্ণ বিয়ে সত্যিই কি আপনি মেনে নিতে পেরেছিলেন? এমনকি, আপনি জোর করে আমায় চাকরিতে ঢুকিয়েছিলেন, তাতেও কি আপনি সুখী হয়েছিলেন? আপনি চেয়েছিলেন আমি ভালো চাকরি করি। কিন্তু আমি চাকরিতে ঢুকেই যে আপনার চেয়ে অনেক বেশী মাইনে পেতে শুরু করলুম তাতে কি আপনার আত্মসম্মানে একটু চিড় লাগেনি? এতদিন সংসার চলতো আপনার টাকায়, এখন ছেলে এসে যদি সংসারের অনেকখানি ভার নিয়ে নেয়, তাতেও কি একটু ব্যথা বাজে না? এই জন্যই বোধহয় পশু সমাজে বয়ঃপ্রাপ্ত, জোয়ান সন্তানদের দল থেকে তাড়িয়ে দেয়।

—আমি পড়বো একটু চিঠিটা?

অনুরাধা কখন উঠে এসে পেছনে দাঁড়িয়েছে, দেবকুমার খেয়ালই করেনি। সে চমকে উঠেছিল।

অনুমতি পাবার আগেই অনুরাধা দু একটা পাতা তুলে নিল।

—নাই বা পড়লে!

পরের চিঠি বা ডায়েরি পড়তে নেই, এই ধরনের নীতি অনুরাধা মানে না। সে সবটা পড়ে শেষ করার পর বললো, কাল সকালেই হয়তো এই চিঠিটা পাঠাতে তোমার লজ্জা করবে। সেইজন্য এটা আমি আমার কাছে রেখে দিচ্ছি। পোস্টম্যানের বদলে আমিই তোমার বাবাকে এটা পৌঁছে দিয়ে আসবো।

—ঠিক আছে, তাই দিও।

—যদি আমার অনুরোধ শোনো, তা হলে শেষের কয়েকটা লাইন কেটে দাও। পশু সমাজের সঙ্গে মানুষের সমাজের অনেক জায়গাতেই মিল আছে। কিন্তু বেশীর ভাগ মানুষই সেটা শুনতে

পছন্দ করে না।

খুঁতখুঁতে লেখকদের মতন জেদী গলায় দেবকুমার বললো, না, যা লিখেছি, তা আর কাটবো না।

—বেশ। তোমার বাবার ডায়েরী পড়তে পড়তে একটা ব্যাপার আমার মনে পড়ে গেল। পুলিশ যখন ভীষণভাবে টোটোর খোঁজ করছিল, তখন ও কোথায় লুকিয়েছিল, তুমি জানতে?

—না।

—তোমার বাবাও জানতেন না। তোমার মা-ও জানতেন না। শুধু আমি জানতাম। কাশীপুরের খুনের ব্যাপারটায় টোটো সত্যিই জড়িত ছিল, ও নিজের হাতে খুন করেনি, কিন্তু দলে ছিল সে সময়। যে খুন হয়েছিল, সে এমনই একটা জঘন্য লোক যে ও ব্যাপারে এই ছেলেগুলোকে শাস্তি দেওয়ার কোনো মানে হয় না। ওরকম জঘন্য লোক সমাজে ঘোরাফেরা করে কেন? কেন পুলিশ আগে থেকে ওদের শাস্তি দেয় না?

—তুমি টোটোদের দলে যোগ দিয়েছিলে নাকি?

—না, তা দিই নি। টোটো সেই সময় হাসনাবাদে লুকিয়েছিল। একজন লোক মারফত খবর পাঠিয়েছিল আমার কাছে। সেই লোকটিকে টোটো বলে দিয়েছিল, যেন শুধু বৌদির সঙ্গেই দেখা করে। আর কারুর সঙ্গে নয়।

—তোমার কাছে ওরা টাকা চেয়েছিল?

—টাকা ওদের আমি দিয়েছি, ওরা চায়নি। টোটো শুধু আমাকে জানিয়েছিল যে ও বেঁচে আছে। কিছুদিন পরে হাসনাবাদেও পুলিশ খোঁজ করতে শুরু করে। সেখানে ওদের থাকা আর নিরাপদ ছিল না। ওদের ভাষায় জায়গাটা হট হয়ে উঠেছিল। তখন আমিই টোটোর অন্য জায়গায় থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম।

—তুমি ব্যবস্থা করেছিলে? কোথায়? তোমার সেই পাইলট বন্ধুর ফ্ল্যাটে?

—তখন বিশ্বজিতের সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি।

—তা হলে কোথায় ?

—আমার ছোট দাদামশাই, পুলিশের ডি আই জি ছিলেন, তুমি তাঁকে দেখোনি. রিটায়ার করে এখন মধুপুরে বাগান-টাগান করেন, তাঁর কাছে রেখেছিলাম টোটোকে। ছোট দাদামশাই আমায় খুব ভালোবাসতেন, তাই আমার অনুরোধ ঠেলতে পারেননি। পুরো আট মাস টোটো ওখানে ছিল।

—তুমি এত কাণ্ড করেছো, অথচ আমায় কিছু বলোনি ?

—ইচ্ছে করেই বলিনি। বলাটা বিপজ্জনক ছিল। সেই জন্য যত কম লোক জানে, ততই ভালো। আমাদের বাড়িতে আমি ছাড়া আর কেউ জানতো না। টোটো যে আমায় বিশ্বাস করেছিল, সে ভেবেছিল, পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করলেও আমি বলবো না, সেজন্য আমার একটু একটু গর্ব হয়।

॥ ১০ ॥

জিনিসপত্র কিছুই গোছানো হয়নি, সব এদিকে ওদিকে স্তূপ হয়ে পড়ে আছে। কল্যাণীদের শোবার খাটটা খুবই বড় ছিল, সেটা এ ঘরে ঢোকানো যায়নি, তাই খাটখানা খুলে উঠোনে রাখা আছে। ঘর একখানা কমে যাওয়ায় টোটো আর জাপানীকে এখন এক সঙ্গে থাকতে হয়। হঠাৎ ওদের পড়াশুনোয় দারুণ মনোযোগ এসে গেছে, সন্ধের পর থেকেই বই সামনে নিয়ে নিঃশব্দে বসে থাকে। আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ে না। পাতলা দেওয়াল পাশের বাড়ির সমস্ত কথা শুনতে পাওয়া যায়।

প্রিয়নাথ এখনো ফেরেননি। কল্যাণীর কিচ্ছু করার নেই বলে কালী সিংহীর মহাভারত খুলে নিয়ে পড়ছেন। এখানে চুপ করে বসে থাকার উপায় নেই, তা হলেই কাছাকাছি ঘরগুলি থেকে অন্য লোকদের কথাবার্তা শুনতে হয়। এখানে পারিবারিক আব্রু বলে কিছু নেই।

আজ বিকেলে কল্যাণী সমস্ত বস্তিটা ঘুরে দেখে এসেছেন। প্রথম কয়েকদিন তিনি সপূর্ণ ঘরের মধ্যে বন্দী হয়েছিলেন। বস্তির অন্যান্য বাসিন্দারা দারুণ কৌতূহলে তাঁদের ঘরে উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেছে, কেউ কোনো কথা বলেনি। আজই কল্যাণী ঠিক করলেন, এখানে যদি থাকতেই হয়, তাহলে এখানকার মানুষজনের সঙ্গেও মেশা উচিত। তিনি মনের গ্লানি ঝেড়ে ফেললেন।

সব এলাকাটা ঘুরে এসে তিনি বেশ বিস্মিতই বোধ করলেন। বস্তি সম্পর্কে আগে তাঁর কোনো ধারণাই ছিল না। 'বস্তির লোক', 'বস্তির ঝগড়া' এই ধরনের কথা অনেকেই ব্যবহার করে, কিন্তু তারা বস্তির আসল চিত্রটা জানে না। কল্যাণীরও এ সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই। কল্যাণীরও জানা ছিল না। জীবনে এর আগে তিনি কোনো বস্তির মধ্যে একবারও পা দেননি। তিনি জানতেন বস্তিতে শুধু খুনে, গুণ্ডা, বদমাইশ ও বেশ্যারা থাকে।

এই বস্তিটা বেশ বড় অন্তত দেড়শোটি পরিবার রয়েছে। এরা অধিকাংশই সাধারণ নিরীহ মানুষ। এখানে বেশীর ভাগই মিস্তিরি, কাঠের মিস্তিরি, রঙের মিস্তিরি, কলের মিস্তিরি। এই ধরনের লোকদের কল্যাণী আগে অনেকবার দেখেছেন। বাড়ির কাজে এদের দরকার হয়, কিন্তু তারা কোথায় থাকে, সে কথা জানার কৌতূহল হয়নি আগে। এখন কল্যাণী বুঝতে পারছেন, কাঠের মিস্তিরি, রঙের মিস্তিরিরা তো ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকবে না, তারা এই রকম সস্তা ঘরেই থাকবে। এরা অনেকেই স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে আছে। আর আছে কিছু ফেরিওয়ালা, গভর্নমেণ্ট অফিসের কিছু আর্দালি পিওন, এমন কি একজন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকও রয়েছেন। রয়েছেন না রয়েছে ? বস্তিতে থাকলেও একজন শিক্ষককে বোধহয় আপনি বলতে হবে।

কাঠের মিস্তিরি বা রঙের মিস্তিরি, যাদের বাঁধা আয় নেই, এক-একদিন কাজ থাকে, আবার এক-একদিন থাকে না, তাদের কারুর কারুর স্ত্রী কাছাকাছি বাড়িতে ঠিকে ঝির কাজ করে আসে। তাদের

দেখেই সবচেয়ে অবাক হয়ে গেছেন কল্যাণী।

কল্যাণী নিজের সংসারে কোনোদিন ঝি চাকর রাখেননি, কিন্তু আগের বাড়ির দোতলায় তো ঠিকে ঝিদের দেখেছেন। তারা যেন এক একটি যন্ত্র। প্রত্যেকদিন এসেই প্রথমে ঝাঁটা দিয়ে ঘর ঝাঁট দেয়, তারপর বালতি ও ন্যাতা দিয়ে ঘর মোছে, তারপর বাসন মাজা, সব নিয়ম মাফিক, কোনোটারই এদিক ওদিক হয় না। ঠিকে ঝিরা যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটে, তখনও যেন কলের পুতুলের মতন তরতরে ভাব। অথচ সেই ঠিকে ঝিরাও যে এক-একটি সংসারের গৃহিণী, তা এই প্রথম উপলব্ধি করলেন কল্যাণী। অবিকল তো অন্য গৃহিণীদেরই মতন। তাদেরও ছেলেপুলে, স্বামী, রান্নাবান্না, ঘর গুছোনো সবই আছে। কয়েকজনের সঙ্গে আলাপও হলো কল্যাণীর।

এই বস্তির মধ্যে আবার একটা প্লাস্টিকের খেলনা বানাবার কারখানাও রয়েছে। পনেরো কুড়িজন লোক সেখানে কাজ করে। কয়েকটা ঘরে ছিটের জামা সেলাই হয়। একটা ঘরে চার-পাঁচজন রীতিমতন ভদ্রলোকের মতন পোশাক পরা লোকও থাকে এক সঙ্গে, নিজেরাই রান্নাবান্না করে, এরা কাজ করে কোনো অফিসে-টফিসে, সারা সপ্তাহ এখানে থেকে শনি রবিবার গ্রামের বাড়িতে চলে যায়।

একদিনেই কল্যাণীর অনেক কিছু জানা হয়ে গেছে। মোটেই ভয়াবহ জায়গা বলে মনে হলো না। অবশ্য এর মধ্যে কোনোখানে দু-একজন খুনে-গুণ্ডা ঘাপটি মেরে আছে কিনা তা বোঝা সম্ভব নয়। তবে মোটামুটি সবাই বেশ শান্তিপ্রিয়। এত বড় বস্তিটার মধ্যে শুধু দুটি পরিবারই রাত্তিরের দিকে খুব চেঁচিয়ে ঝগড়া করে, বিশ্রী গালমন্দ দেয়। অন্যরা কেউ তাদের পছন্দ করে না, দু-একজন দূর থেকে ধমক দিয়ে বলে, আঃ, তোমরা একটু চুপ করবে?

তবে, গলিগুলো দারুণ নোংরা আর চতুর্দিকে সবসময় একটা ভ্যাপসা গন্ধ। একটু বৃষ্টি হলেই সেই গন্ধটা বেশী ছড়িয়ে পড়ে। এই গন্ধটার জন্যই মন খারাপ লাগে। কল্যাণী এই জন্য ঘরের মধ্যে সারা দিন ধূপ জেলে রাখেন।

তাঁদের ঠিক পাশের ঘরেই থাকে একজন খুব বৃদ্ধ লোক। বুক পর্যন্ত সাদা দাড়ি, মাথায় টাক। লোকটির বয়েসের গাছ পাথর নেই মনে হয়। বুড়োটি ঘর থেকে প্রায় বেরোয়ই না, সারা দিন ঘঙর ঘঙর করে কাশে আর একা একা কথা বলে। সেটা প্রথম প্রথম বোঝা যায়নি। মনে হতো, ঠিক যেন সামনে কেউ রয়েছে, এমন কি এক-একদিন মাঝ রাত্রেও মনে হয়েছে, বুড়োটি যেন কাকে বকছে। কিন্তু ওঘরে আর কেউ থাকে না। এখানকারই একটি তের চোদ্দ বছয়ের মেয়ে ওর জন্য টিউবওয়েল থেকে জল এনে দেয় আর সামনের দোকান থেকে দু বেলা খাবার আনে।

কল্যাণী অবাক হয়ে ভাবেন, বুড়োটির কি কেউ নেই? সম্পূর্ণ একা? সারা দিন ঐ ঘরে বসে থেকে থেকে বুড়োটি কি মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে? তা হলে কথা বলে কার সঙ্গে? মৃত্যুর সঙ্গেই নাকি?

সওয়া দশটার সময় প্রিয়নাথ ফিরলেন। কল্যাণী উঠে পড়ে স্বামীর খেতে বসার জন্য আসন পাতলেন মেঝেতে।

—ছেলেমেয়েরা খেয়েছে?

—হ্যাঁ।

কল্যাণীও খেতে বসবেন প্রিয়নাথের সঙ্গে। খাবারের থালা বাসন গুছিয়ে নিয়ে বসামাত্র আলো নিভে গেল।

প্রিয়নাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। সারাদিন খেটেখুটে আসবার পর বিদ্যুতের এই ব্যবহার কারুর ভালো লাগে না। কল্যাণী উঠে হাতড়ে হাতড়ে একটা মোম খুঁজে পেলেন, কিন্তু দেশলাই আনতে হবে সেই রান্নাঘর থেকে, উঠোনটা যা পিছল, এই অন্ধকারে যেতে ভয় করে। টোটো সিগারেট খায়, ওর কাছে দেশলাই আছে।

টোটো, রান্নাঘর থেকে একটু দেশলাইটা দিয়ে যাবি?

টোটো কাঠি জ্বালতে জ্বালতে এল এ ঘরে। মোমটা ধরিয়ে দিয়ে গেল।

কল্যাণী দু থালায় খাবার তুলে দিতে লাগলেন।

—তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে, কল্যাণী?

—নাঃ!

—ছ্যাখো, তোমাদের এর চেয়ে ভালোভাবে রাখা আমার সাধ্যে কুলোলো না।

—আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না। তুমিই নোংরা সহ্য করতে পারো না। পায়খানাটা একটু নোংরা থাকলে তুমি চ্যাঁচামেচি করতে।

—কী আর করা যাবে বলো। মানুষ এর চেয়েও কত কষ্টে থাকে। আমি দেখে এসেছি। তবু তো আমরা মাথা গোঁজার একটু জায়গা পেয়েছি—বেঁচে থাকার এমনই অদ্ভুত নেশা, মানুষ যে-কোনো জায়গায় বেঁচে থাকতে পারে।

কল্যাণীর মনে পড়লো, পাশের ঘরের বৃদ্ধটির কথা। ঐ লোকটিও বুঝি শুধু নেশার জন্যই বেঁচে আছে। এ ছাড়া জীবনে কী আছে ওর? শুধু একটা অন্ধকার ঘরে বসে থাকা, দিনের পর দিন, দিনের পর দিন···

—বউমা বিকেলে এসেছিল।

—তাই নাকি? এখানেও সে আসে?

—প্রায়ই তো আসে। তোমার সঙ্গে দেখা হয় না, হবেই বা কী করে, তুমি তো কোনো দিনই বিকেলে থাকো না।

—এবার থেকে থাকবো। টিউটোরিয়ালের কাজটা আগামী মাস থেকে চলে যাবে।

সংসারের ব্যাপারে কোনো আগ্রহ দেখাবেন না ভেবেও কল্যাণী চমকে উঠলেন. আপনা আপনিই জিজ্ঞেস করলেন, কেন?

—বুড়ো ধুড়োদের আর রাখতে চায় না আর কি। কত শিক্ষিত ছেলেরা কাজের জন্য ঘুরছে···আমায় ঠিক ছাঁটাই করছে না, ক্লাস কমিয়ে দিয়ে মাইনে ওয়ান ফোর্থ করে দিতে চায়· ও অবস্থায় টেকা যায় না। স্কুল থেকে রিটায়ার করলে দেখবে তখন টিউশানিও পাবো না···কল্যাণী, আমি যদি কোনোদিন তোমায় গাছতলায় নিয়ে রাখি, তুমি থাকতে পারবে?

কল্যাণী চুপ করে রইলেন। এ কথায় তিনি কী উত্তর দেবেন? একটু বাদে তিনি বললেন, বৌমা, তোমায় একটা চিঠি দিয়ে গেছে।

—কার চিঠি?

—তোমার। দেবু তোমাকে লিখেছে।

প্রিয়নাথ একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। দেবুর নাম উচ্চারিত হলেই তার বুকের মধ্যে একটা অভিমানের কুয়াশা এসে যায়। দেবুর ছেলেবেলার চেহারা মনে পড়ে। মাথার বাঁ দিকে পাট করে চুল আঁচড়াতো। কী সরল সুন্দর মুখ।

—কী লিখেছে সে?

—আমি পড়িনি। খাম একটা।

এখন আলো নেই, সে চিঠি পড়া যাবে না। প্রিয়নাথ খুব একটা আগ্রহও দেখালেন না। নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করে উঠে গেলেন। হাত মুখ ধুয়ে এসে মেঝেতে পাতা বিছানায় শুয়ে পড়ে বললেন, আ—। সে শব্দটা আরামের নয়, দুঃখের নয়, অভিমানের নয়, অন্য-রকম একটা কিছু।

পাশের ঘরে দুখানি খাট কোনোরকমে আঁটানো গেছে। মাঝ-খানে মাত্র এক চিলতে জায়গা। সেখানে একটা কাঠের টুলে মোম-বাতি রাখা।

টোটো জিজ্ঞেস করলো ছোড়দি, তুই এখনো পড়বি?

—হ্যাঁ।

—তাহলে মোমবাতিটা তোর ওদিকে নিয়ে রাখ। আমি ঘুমোবো।

সঙ্গে সঙ্গে টোটো চট করে নিজের গায়ে এক চড় কষালো। ঠিক তালে তাল মিলিয়ে জাপানীও চড় মারলো নিজেকে। আলো নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁক ঝাঁক মশা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আগে ওরা যে বাড়িতে ছিল, সেখানে তিনতলায় মশার কোনো বালাই ছিল না। এতদিনের সংসারে কল্যাণী কখনো মশারি কেনেননি। এবার কিনতেই হবে, সামনের মাসে।

ওবাড়ি থেকে আনা তিনটে পাখা অব্যবহার্য হয়েই থাকতো। কিন্তু সিলিং-এর কাঠের শালবল্লার সঙ্গে লোহার এস জুড়ে টোটো অনেক কায়দা করে দু ঘরে দুটো পাখা টানিয়েছে। বাকি পাখাটা সে বেচে দিয়েছে বাবাকে কিছু না বলেই। দু ঘরের পাখা দুটো যখন চলে, তখন ওপরের শালবল্লাটা এমন নড়ে যে ভয় হয়, হঠাৎ বুঝি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। টোটো অবশ্য বলে, কিছু হবে না। এমনিতে হাওয়া চলাচলের কোনো পথ নেই বলে ঘরগুলোতে অসহ্য গরম। রাত্তিরবেলা টোটোর ভালো করে ঘুমোনো চাই-ই, ঘুমের ব্যাঘাত হলে তার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।

—আমাদের ও বাড়িতে এত হাওয়া ছিল যে লোডশেডিং-এর সময়ও গরম লাগতো না।

জাপানী বললো, ঘুমোবি বলছিলি আবার বকবক করছিস কেন? আমায় পড়তে দে!

তখন টোটো ঠিক করলো জাপানীকে সে জ্বালাতন করবে। উঠে বসে সিগারেট ধরালো। জোরে কথা বললে পাশের ঘরে বাবা মা শুনতে পাবেন বলে সে ফিসফিস করে বললো, তুই শর্মিলাদির দাদার সঙ্গে প্রেম করছিলি না? এই বস্তিতে থাকিস শুনলেই দেখবি প্রেম চটে যাবে।

শর্মিলার দাদা হিরণ্ময়ের সঙ্গে মাত্র দু-একদিন চাইনিজ রেস্তো-রাঁয় খেতে গেছে জাপানী, তাও সঙ্গে আরও দু-তিনজন ছিল। সেও তো এক বছর আগে। টোটো বোধহয় দেখে ফেলেছে আর অমনি ভেবেছে প্রেম। এই বাচ্চা ছেলেগুলোকে নিয়ে আর পারা যায় না।

—তুই তা হ'লে কী করবি? তুই বুঝি বস্তির মেয়েদের সঙ্গেই প্রেম করবি।

—আমি তো এখানে থাকছিই না। এই মশা, গরম, চারিদিকে পেচ্ছাপের গন্ধ, এর মধ্যে আমার পোষাবে না।

জাপানী একটু ভয় পেয়ে গেল। দাদার মতন টোটোও পালাবে? টোটোকে কিছু বিশ্বাস নেই।

—তোরা ছেলেরা সবাই কাওয়া। তোদের দয়া মায়া, ভালো-বাসা তো কিছু নেই-ই, কৃতজ্ঞতাও নেই।

—তুই যে সব ছেলেদের সঙ্গে প্রেম করিস, তারাও এই দলের বুঝি?

—টোটো, মুখ সামলে কথা বলবি।

—রেগে যাচ্ছিস কেন, ছোড়দি।

—কেন আমার পড়ায় ডিসটার্ব করছিস! বাবাকে ডাকবো?

—কিস্যু লাভ নেই। বাবা তো আমায় বকুনি দেওয়া ছেড়ে দিয়েছেন! আজকাল মারধোর বকুনি সব স্টপ। বাবা তো বলেই দিয়েছেন ইচ্ছে মতন চরে খাও।

—তাই চরে খা না। আমায় পড়তে দে!

—ঠিক আছে, পড় বাবা, পড়। আমার দ্বারা পড়াশুনো হবে না। বাবা আমায় জোর করে পড়াবার চেষ্টা করলে কী হবে, দাদার মতন আমার মাথা নেই। আমি কারখানায় কাজ নিলে ভালো পারতুম।

—সে রকম একটা কাজ জুটিয়ে নিতে পারিস না! তাহলেও তো বাবার একটু সাহায্য হতো।

—তার চেয়ে অনেক ভালো কাজ ঠিক করেছি। আমি আর্মিতে চলে যাচ্ছি।

—অ্যাঁ?

—সব প্রায় ঠিকঠাক। বউদির ছোড়দাদু যদি আমায় পুলিশ রেকর্ডটা ঠিক করে দেয়, তাহলে সিওর চান্স পেয়ে যাবো। সামনের মাসের ফিফটিন্‌থ।

—তুই মাকে কিংবা বাবাকে কিছু বলিসনি?

—এসব কাজ বাপ মাকে বলে হয় না। টিপিক্যাল বাঙালী মধ্য-বিত্ত সেন্টিমেণ্ট, আর্মিতে গেলেই যেন লোকে মরে যায়। কলকাতার রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়ে লোকে মরে না?

—বৌদি জানে?

হ্যাঁ, শুধু বৌদি জানে। বৌদি কারুকে বলবে না আমি জানি। তুই এখন মায়ের কাছে গিয়ে চুকলি কাটলেও কোনো লাভ নেই। আমি যাবোই। এ কথাও জেনে রাখ, আমি যাচ্ছি, তোদের ভালোর জন্য। সিমলা বা ডেরাডুন-ফেরাডুন কোথাও চলে যাবো, আর্মির লোকেদের থাকার খাওয়ার খরচা প্রায় কিছুই লাগে না। মাইনের সব টাকাটা পাঠিয়ে দেবো মায়ের কাছে। তখন তোরা আবার এই বস্তি ছেড়ে উঠে যাবি ভালো বাড়িতে। বাবা আমার টাকা রিফিউজ করতে পারবেন না। কোনো মরাল গ্রাউণ্ড নেই। আমি তো দাদার মতন বউ নিয়ে বাড়ি ছেড়ে পালাইনি। দাদার মতন পেটি বুর্জোয়ারা এই রকমই করে। ওরা শুধু নিজের কমফর্ট বোঝে।

—তুই দাদার সমালোচনা করছিস? দাদার মতন মানুষ হয়? দাদা যা করেছে ঠিকই করেছে। তুই তো বড় বড় বিপ্লবের কথা বলিস, সেই তুই-ই এখন আর্মিতে চাকরি নিচ্ছিস। লজ্জা করে না।

—তুই এসব বুঝবি না রে ছোড়দি। আর্মিতে ঢুকছি, তার বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। আমরা অনেকেই যাচ্ছি। আর্মিতে ঢুকে আমরা রেভোলিউশান করবো। আর্মিকে হাতে না পেলে কোনো দেশে বিপ্লব সফল হয় না। আমি যখন ফিরে আসবো, তখন কলকাতা শহরে আর একটাও বস্তি থাকবে না। সারা দেশের কোথাও থাকবে না, আমরা মার্চ করে ঢুকবো, ধ্বংস স্তূপের ওপর গড়ে তুলবো নতুন সমাজ...

কাছেই একটা ঘর থেকে একজন স্ত্রীলোক কেঁদে উঠলো ও একজন পুরুষ বিশ্রী ভাষায় গালাগাল দিতে লাগলো বলে থেমে গেল ওদের কথাবার্তা।

একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়লো টোটো। সে ঘুম তেমন গভীর নয়। মশার জ্বালায় ও গরমে সে বার বার ছটফটিয়ে উঠছে, ঘুমোতে ঘুমোতে মাথাটা নাড়ছে এদিক ওদিক। সেদিকে চেয়ে হঠাৎ এক দুর্লভ মায়া জাগলো জাপানীর মনে। যদিও দুই পিঠোপিঠি ভাইবোনে

অহি-নকুল সম্পর্ক, তবু আজ জাপানীর মনে হলো এই গোঁয়ার ছোট ভাইটা সত্যিই হয়তো অনেক দূরে চলে যাবে। সে তার কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিক্যালের চওড়া বাঁধানো খাতাটা দিয়ে হাওয়া করতে লাগলো টৌটোকে।

এখানে উঠে আসার পর জাপানী তার বন্ধু বান্ধবীদের কারুর সঙ্গেই দেখা করেনি একদিনও। এক এক সময় তার এত লজ্জা করে বা ইচ্ছে হয় আত্মহত্যা করতে। সে বাবার এই জেদটাকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারবে না কোনোদিন। বাবা তার জীবনটা কষ্ট করে দিলেন। জাপানী আর কোনোদিন কোনো ভদ্র ছেলেমেয়ের সঙ্গে মিশতে পারবে না। কোনোরকমে পার্ট টু পরীক্ষাটা দিয়েই সে দূরে কোথাও স্কুল মাস্টারি নিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করবে।

বিকেলবেলা গলির মোড়ে হঠাৎ জাপানী থমকে দাঁড়িয়ে গেল। কয়েক মুহূর্তের জন্য সে একটি পাষাণ মূর্তি। পায়জামা পাঞ্জাবি পরা একজন দীর্ঘকায় পুরুষ মাঝে মাঝে বড় রাস্তার দোকানের সাইন বোর্ড পড়তে পড়তে এদিকেই আসছে।

জাপানী একবার ভাবলো, পেছন ফিরে দৌড়ে পালিয়ে যাবে, তাদের অন্ধকার ঘরে গিয়ে লুকোবে। ঐ বস্তির মধ্যে তার চেনা কেউ কোনোদিন তাকে খুঁজে পাবে না। পরমুহূর্তেই সে বুঝতে পারলো, সেটা ভুল।

তিমির দাশগুপ্ত কাছে এসে বললেন, বাঃ, তুমি বেশ মেয়ে তো। বাড়ি বদলেছো, সে কথা আমাকে জানাওনি ?

জাপানীর বুক কাঁপছে। এই মানুষটাকে দেখলেই তার যে কেন এমন হয়। সে কোনো কথা না বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

তিমির দাশগুপ্ত বললেন, তুমি ঠিকানা দিয়েছিলে, তোমাদের সেই আগের বাড়িতে গিয়ে ঘুরে এলাম। ওরা নতুন বাড়ির ঠিক ঠিকানা বলতে পারে না, বললে মানিকতলার এদিকে কোথাও যেন, শেষ পর্যন্ত পোস্ট অফিসে গিয়ে ঠিকানা পেলাম।

জাপানী ভাবলো, পরিতোষদারা কি বলে দিয়েছে, মানিকতলার

দিকে কোনো বস্তিতে ? তা জেনেও তিমির দাশগুপ্ত এসেছেন ?

—তুমি আমাদের ওখানে আর তো গেলে না। তোমাদের পরীক্ষা তো দেড় মাস পিছিয়ে গেল। আরও পিছোবে কিনা কে জানে। চলো, তোমাদের বাড়িতে চলো।

—না।

তিমির দাশগুপ্ত সরল বিস্ময়ে বললেন, আমাকে তোমাদের বাড়িতে নিয়ে যাবে না ?

—না। আপনি বড় দেরি করে ফেলেছেন।

—হ্যাঁ। আমি যেদিন আসবো বলেছিলাম আসতে পারিনি, আমরা আবার একটা কল শো-তে বাইরে গিয়েছিলাম, রিহার্সালও ন্যাচারালি বন্ধ ছিল কয়েকদিন, এবার আবার জোরদার করে শুরু হবে···আমাকে তোমাদের বাড়িতে নিয়ে যাবে না কেন ?

—কী হবে আর ?

—আমি তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করবো।

—তার আর কোনো দরকার নেই।

তিমির দাশগুপ্ত একটু থতমত খেয়ে গেলেন। জাপানীর গাঢ় স্বর শুনে তিনি ভুল বুঝে বললেন, তার মানে ? তোমার বাবা কি···মারা গেছেন ?

জাপানীর এক ঝলকের জন্য মনে হলো, বাবা মরে গেলেই বুঝি ভালো ছিল। পরক্ষণেই সে নিজেকে তীব্র ভর্ৎসনা করলো। ছিঃ।

—না, আমার বাবা মারা যাননি। কিন্তু উনি যদি রাজিও হন, তবু আমি থিয়েটার করবো না। কিছুতেই না।

—আমি এতদিন আসিনি বলে তুমি রাগ করেছো বুঝি ?

জাপানীর ইচ্ছে হলো, তিমির দাশগুপ্তের বুকে মাথা রেখে কাঁদে। তিমির এক্ষুণি একটা ট্যাকসি ডেকে তাকে কোথাও নিয়ে যেতে পারে না ? গঙ্গার ধারে সেখানে ওর পাশে বসে জাপানী শুধু কিছুক্ষণ কাঁদবে। এইটুকু যদি দয়া করে তিমির, তাহলে তার বদলে সে যা চাইবে, জাপানী তাই দেবে।

জাপানীকে চুপ করে থাকতে দেখে তিমির দাশগুপ্ত আবার বললেন, ঠিক আছে, থিয়েটার না করতে চাও করবে না। কিন্তু তোমার বাবার সঙ্গে আলাপ করতে ক্ষতি কী? চলো, তোমাদের বাড়িতে চলো, এক কাপ চা তো অন্তত খাওয়াবে।

—তিমিরদা, আমাদের কোনো বাড়ি নেই।

—বাড়ি নেই মানে? এই তো একটা ঠিকানা রয়েছে।

—সেখানে আপনাকে নিয়ে যাওয়া যায় না।

—কেন, আমি কি কোনো ভি আই পি নাকি? চলো, চলো

—তিমিরদা, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

—হ্যাঁ করবে। কিন্তু রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেন! তোমাদের বাড়িটা আমি একটু দেখতে চাই। সেখানে বসে কথা বলা যেতে পারে।

—আমাদের ওখানে আপনাকে বসাবার তেমন কোনো জায়গা নেই। তার আগে আমার কথাটা শুনুন। আপনার কি সত্যিই ধারণা আমার দ্বারা নাটকের অভিনয় সম্ভব!

—নিশ্চয়ই সম্ভব।

—তা হলে আমি পরীক্ষা দিতে চাই না, আজ থেকেই আপনা-দের দলে যোগ দেবো। আমি আর বাড়ি ফিরতে চাই না, আপনি আমাকে একটা থাকার জায়গা দিতে পারেন?

তিমির দাশগুপ্ত তক্ষুনি কোনো উত্তর দিলেন না। মঞ্চের ওপরে তাঁর বিখ্যাত ভঙ্গিতে তিনি কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন জাপানীর দিকে। তারপর কড়া গলায় বললেন, শোনো, আমরা সিরিয়াসলি নাটক করার চেষ্টা করছি, প্রেমের আখড়া খুলিনি। আমাদের দরকার কিছু ডেডিকেটেড নাট্যকর্মীর, ঘর পালানো ছেলে মেয়েদের নয়।

—ও!

—চলি!

—আচ্ছা!

—বাড়ি যাও, ভালো করে মন দিয়ে পড়াশুনো করো।

—আপনার উপদেশের কোনো দরকার নেই আমার। আপনারা

গ্রামের মেয়ের দুঃখ নিয়ে নাটক করতে পারেন, আর কলকাতায় একটি বস্তির মেয়ে আপনাদের কাছে সাহায্য চাইলে আপনারা মুখ ফিরিয়ে চলে যান।

—তোমার কী হয়েছে বলো তো? মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি? এই বস্তিতে তোমরা এখন থাকো? বেশ তো, বস্তিতে কি মানুষ থাকে না?

—থাকবে না কেন? কিন্তু আমি থাকতে চাই না। যেমন আপনি সেখানে থাকতে চান না।

—দ্যাখো জাপানী, আমাদের এমনিতেই অনেক সমস্যা আছে, আর সমস্যা বাড়িও না।

—বুঝেছি, আপনি এখন পালাতে পারলে বাঁচেন।

—আমি তোমাকে কোথায় থাকার জায়গা দেবো? তা ছাড়া তুমি হুট করে বাড়ি ছেড়ে চলে আসতে চাইলেই বা।

—কেন, আপনার বাড়িতে আমার জায়গা হতে পারে না?

—আমাদের বাড়িতে?

তিমির দাশগুপ্ত হাসলেন। জাপানী যেন একটি অতি বাচ্চা মেয়ে, এইভাবে তার দিকে সস্নেহে চেয়ে তিনি বললেন, আমাদের বাড়িতে কতলোক তুমি জানো? তা ছাড়া সেখানে তোমায় নিয়ে গেলে—

জাপানীর মাথার মধ্যে চড়াৎ করে উঠলো, একটা কথা সে ভেবেই দেখেনি আগে। তিমির দাশগুপ্তর বিয়ে হয়ে গেছে কিনা, সে জানে না। যদি বিয়ে নাও হয় তবু তিনি একজন খ্যাতিমান সুপুরুষ। এর আগে কি আরো অনেক মেয়ে তাঁর প্রেমে পড়েনি! কিংবা তিনিও কয়েকজনের? এতদিন ধরে কোনো পুরুষ মানুষ কি খালি থাকে? সেদিন যে প্রভাতী নামে মেয়েটি ওঁর সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলছিল।

লজ্জায় লাল হয়ে গিয়ে জাপানী বললো, না না, আমি সত্যিই পাগলের মতন উল্টো পাল্টা বকছি। আপনি যান—

তিমির দাশগুপ্ত সহাস্য মুখে বললেন, আমি আজ যাচ্ছি। কিন্তু আমি আবার আসবো। তুমি একটা পাগল মেয়ে ঠিকই, তবু তোমাকে আমার ভালো লেগেছে।

॥ ১১ ॥

সকালবেলা চোখের সামনে খবরের কাগজটা লম্বা করে মেলে ধরেছে দেবকুমার, রবিবার সকালটা তার অনেকক্ষণ ধরে কাগজ পড়া অভ্যেস, সেই জন্য দু তিনটে কাগজ রাখে। অনুরাধা বিছানা থেকে বালিশের ওয়াড়গুলো খুলছে। এটা তারও রবিবারের কাজ। পাশের ঘরে ছুটোছুটি করছে বুনবুন। কোথাও থেকে সে একটা বিড়ালের ছানা ধরে এনেছে। বেড়াল ঘাঁটাঘাঁটি করলে ডিপথিরিয়া হতে পারে বলে আপত্তি জানিয়েছিল দেবকুমার, কিন্তু অনুরাধা বেড়াল পছন্দ করে। সে সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল যে বুনবুনের সেরকম কোনো ভয় নেই, কারণ ওর ট্রিপল অ্যাটিজেন নেওয়া আছে। অনুরাধার সব দিকে খেয়াল থাকে।

কাগজ থেকে মুখ তুলে দেবকুমার জিজ্ঞেস করলো, তোমার সেই পাইলট বন্ধুর পদবীটা কী যেন ?

—ঘোষাল। কেন !

—খারাপ খবর আছে।

সঙ্গে সঙ্গে অনুরাধা চোখের সামনে দেখতে পেল একটা জ্বলন্ত বিমান আকাশ থেকে ঘুরতে ঘুরতে নামছে, আর তার থেকে ছিটকে ছিটকে পড়ছে মানুষের হাত, পা।

—কী হয়েছে, দেখি !

কাগজের প্রথম পাতার নীচের দিকে বেশ বড় হরফেই আছে খবরটা। আরবদেশের একটি বিমান আকাশে ছিনতাই করে ছিল সন্ত্রাসবাদীরা। সেটা শেষ পর্যন্ত ত্রিপোলিতে নামে। কয়েক ঘণ্টা

অপেক্ষা করার পর আলোচনার ছুতোয় বিমান-বন্দরের রক্ষীরা সন্ত্রাস-বাদীদের ওপর গুলি চালায়।

এরকম ঘটনা ইদানীং এত বেশী ঘটছে যে খবর হিসেবে একঘেয়ে হয়ে গেছে। সবাই সবটা পড়ে না। তবু দেবকুমার খুব মন দিয়ে পড়ছিল, এমনকি শেষের আহতদের তালিকা পর্যন্ত।

খবরের হেডিংটুকু দেখেই অনুরাধা সাদা মুখে জিজ্ঞেস করলো, মরে গেছে?

—না। সম্ভবত না। ক্রস ফায়ারে পড়ে একজন ইণ্ডিয়ান পাইলট গুরুতর আহত, এই কথাই লিখেছে।

বিশ্বজিৎ প্রায় চার মাস আসেনি, গত এক মাস কোনো চিঠিও লেখেনি। সাধারণত সে অনুরাধাকে চিঠি লেখে তার নিজের ফ্ল্যাটের ঠিকানায়, অনুরাধা মাঝে মাঝে গিয়ে লেটার বাক্সটা দেখে আসে।

বিশ্বজিৎ বলেছিল, হঠাৎ হয়তো দেখবি, আমি আর ফিরলামই না। আমার আর কোনো খোঁজই পেলি না। আমি তো উড়নচণ্ডী, একদিন উড়তে উড়তেই পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাবো।

অনুরাধা একটু পাশ ফেরা অবস্থায় জানালার দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। দেবকুমার জানে, অনুরাধা ডুকরে কেঁদে উঠবে না। ঐরকম ভাবেই হয়তো দাঁড়িয়ে থাকবে অনেকক্ষণ।

সে অনুরাধার হাত ধরে কাছে টেনে বললো, ইস্!

অনুরাধা অন্যমনস্ক গলায় বললো, কী জানি এখনো বেঁচে আছে কি না।

—নিশ্চয়ই বেঁচে যাবে। প্রথমে যখন কিছু হয়নি ও যা সাহসী, নিজেই হয়তো ডাকাতদের ধরতে গিয়েছিল।

—রেডিওতে ওদের খবর বলবে না?

ছোট রেডিওটা ড্রেসিং টেবলের ওপর থেকে তুলে নিয়ে অনুরাধা কাটা ঘোরালো। এখন খবরের সময় নয়, এখন গান, এইরকম মনের অবস্থায় গান শুনলেও গা জ্বালা করে। অনুরাধা কট্ করে রেডিওটা বন্ধ করে দিল।

—আমার যদি টাকা থাকতো, আমি তোমাকে আজই ত্রিপোলিতে পাঠিয়ে দিতাম। তুমি ওর সেবা করতে পারতে।

অনুরাধা গভীর বিস্ময়ভরা চোখ দিয়ে দেবকুমারের দিকে তাকালো। দেবকুমারের কথায় কি ব্যঙ্গের সুর আছে? একজন মানুষ মুমূর্ষু কিংবা এতক্ষণে বোধহয় মরেই গেছে, তার সম্পর্কে কি কেউ ব্যঙ্গ করতে পারে?

—দেবকুমার আবার বেশ কোমলভাবে বললো, বিদেশ বিভুঁইয়ে একদম একা, কোনো আত্মীয়স্বজন নেই. অথচ এই সময় কারুকে দেখতে ইচ্ছে করে।

অনুরাধা বললো, ওর মা খবর পেয়েছেন কি না কে জানে! ওঁদের ওখানে বিকেলে কাগজ যায়।

—ওর মায়ের পক্ষে এখন খবরটা না জানাই তো ভালো। শুধু শুধু চিন্তা করবেন। বরং তোমার মতন কেউ এখন বিশ্বজিতের পাশে থাকলে ওর অনেক ভালো লাগতো। তোমার যেতে ইচ্ছে করছে না? অনেক টাকার ব্যাপার।

—সম্ভব হলে আমি নিশ্চয়ই যেতাম।

তারপর একটু থেমে, স্বামীর দিকে শান্ত. নিষ্পলক দৃষ্টি ফেলে অনুরাধা বললো, আমি বিশ্বজিৎকে ভালোবাসি।

—জানি।

এরপর কিছুক্ষণ দুজনেই সম্পূর্ণ চুপ। একটু বাদে দেবকুমার বললো, সিগারেট-দেশলাই দাও তো, ঐ যে ওখানে আছে।

—তুমি কি চাও আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাই?

—কোথায় যাবে! হঠাৎ একথা!

তুমি আমার দিকে তাকাও। অন্যদিকে চেয়ে আছো কেন! তুমি কি বলতে চাইছো, আমি বুঝতে পারছি না। তুমি বারবার বলছো কেন, ওকে দেখবার জন্য আমার ত্রিপোলিতে যাওয়া উচিত!

—এটাই কি স্বাভাবিক নয়! মানুষ সব কিছু পাবে না, কিন্তু ইচ্ছেটাকে তো বাধা দেওয়া যায় না। তোমার কি ওর কাছে যেতে

ইচ্ছে হয়নি।

—আমি বিশ্বজিৎকে ভালোবাসি, সেটা লুকোবার কিছু নেই।

—হয়তো ওর সারা বুকে এবং মাথায় ব্যাণ্ডেজ, হাসপাতালের খাটে শুয়ে একটু আগে জ্ঞান ফিরে এসেছে, ব্যাকুলভাবে চাইছে এদিক ওদিক, যদি একটা কোনো চেনা প্রিয়মুখ দেখা যায়।

—আঃ চুপ করো।

দেবকুমারকে যেন একটা নেশায় পেয়ে বসেছে। সে দেখতে চায়, অনেক চেষ্টা করে অনুরাধাকে কাঁদানো যায় কিনা। নিজেই হাত বাড়িয়ে সিগারেট দেশলাই নিয়ে এসে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো, তুমি রবীন্দ্র সঙ্গীত ভালোবাসো, আমীর খাঁর গলা রবিশঙ্করের বাজনা ভালোবাসো, লাল গোলাপ আর বিদেশী পারফিউম ভালোবাসো, ছেলেবেলার একজন বন্ধুকেও যে ভালোবাসবে, এতে আর আশ্চর্য কী আছে?

—আমি চলে যাবো, আজই চলে যাবো।

—কোথায়? বাপের বাড়িতে?

যে মেয়েরা নিজের ইচ্ছেয় বিয়ে করে, তারা কখনো বাপের বাড়িতে ফিরে যায় না। আমি নিজেই যা হোক একটা ব্যবস্থা করে নিতে পারবো।

—কেন পাগলামি করছো, মণি? তোমার চলে যাওয়ার তো কোনো প্রশ্ন ওঠে না।

—আমি জানি, তুমি আজকাল আর আমায় সহ্য করতে পারো না।

—বিশ্বজিতের জন্য? পাগল নাকি। বিশ্বজিতকে প্রথম দিন দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি, ওর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামলে আমি হেরে যাবো। এ পৃথিবীর বিশ্বজিৎরা সব সময় জিতে যায়। ওরা প্রেমিক। প্রেমিকদের সঙ্গে স্বামীদের কোনো তুলনাই হয় না। ধরো, আজ যদি বিশ্বজিতরা মরেও গিয়ে থাকে, তবু ও মরবে না। বিশ্বজিৎরা অমর। তোমার মনের মধ্যে ও দিন দিন আরও বড় হয়ে

উঠবে। সেই জন্যই আমি চাই, বিশ্বজিৎ বেঁচে থাকুক, তোমার একজন গোপন বিশ্বজিৎ বেঁচে থাকুক, সেখানে আমার মাথা গলাতে চাওয়া উচিত নয়।

—তুমি মহৎ হবার ভান করছো।

—তুমি বিশ্বজিতকে ভালোবাসো, আমাকেও কি ভালোবাসো না?

সরাসরি এ প্রশ্নের উত্তর দিল না অনুরাধা। সে এখন একটু একলা চুপচাপ থাকতে চাইছিল, দেবকুমার কেন ঠিক এই সময়েই তার বাছা বাছা তীরগুলো ছুঁড়তে চাইছে? তার চোখ জ্বালা করছে, অভিমান এসে আটকে আছে গলার কাছে। সে বললো, তুমি আজকাল কতটুকু সঙ্গ দাও আমাকে? অফিস, অফিসের পার্টি, নয়তো ট্যুর। কখনো বাড়িতে থাকলেও আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও না। তোমার বাবা মায়ের ঐ অবস্থার জন্য তুমি মনে মনে আমাকেই দায়ী করো, জানি!

দেবকুমার হঠাৎ গর্জন করে উঠলো, তুমি আমাকেও ভালোবাসো কিনা, তার উত্তর দিলে না? এড়িয়ে যাচ্ছো?

—অসভ্যের মতন চেঁচিও না, পাড়ার সবাইকে শুনিয়ে।

—উত্তর দাও আগে।

অনুরাধা তাড়াতাড়ি এসে সুনীলদাদের বাড়ির দিকের জানলা দুটো বন্ধ করে দিল। তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে দেয়ালে পিঠ চেপে বললো, ভালোবাসা মানে তুমি কী বোঝ? তুমি শুধু চাইতে জানো, দিতে জানো কতটুকু?

—তার মানে, আমি একটা বর্বর। তুমি সব সময় চলে যাবো বলে আমায় ভয় দেখাতে চাও কেন? এই সংসারটা আমরা দুজনে মিলে গড়ে তুলিনি? তোমার জন্য আমি অনেক কিছু ত্যাগ স্বীকার করিনি?

—জানি, এই কথাটাই তোমার মনের মধ্যে গেঁথে আছে। তুমি আমার জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছো। তুমি আমার জন্য বাবা মাকে

ছেড়েছো। আসলে তুমি মাদারস্ চাইলড। তুমি ভাবো যে আমি চলে গেলেই সব সমস্যা মিটে যাবে। তুমি একটা বিরাট হিপোক্রিট। তুমি চাও, অফিসের পার্টিতে গিয়ে মদ খাবে, ম্যানেজারের বউয়ের সঙ্গে নাচবে, আবার নিজের বাবা-মায়ের কাছেও ভালো ছেলে হয়ে থাকবে। আর আমি শুধু মুখ বুঁজে তোমাদের সেবা করে যাবো। আমার কোনো আলাদা জীবন থাকবে না!

—আমি তোমার কোনো কাজে বাধা দিয়েছি কখনো? অকৃতজ্ঞ কোথাকার? আমি ট্যুরে বাইরে যাই, তুমি একলা থাকো, যা খুশী তাই করতে পারো।

—আর তুমি বুঝি ট্যুরে গিয়ে যা খুশী তাই করতে পারো না? তোমার বন্ধুরা ফিসফাস করে আর চাপা হাসিতে কী সব গল্প করে তা বুঝি আমি কখনো শুনিনি? সব স্বাধীনতা শুধু পুরুষদের?

অসম্ভব রেগে গেলেও দেবকুমারের মনের মধ্যে একটু কৌতুকও খেলা করছে। এই অবস্থাতেও সে ভাবছে, অনুরাধা আজ কোন জিনিসটা ভাঙবে?

কিন্তু কিছু ভাঙার বদলে অনুরাধা ঝপাৎ করে আলমারি খুলে শাড়িগুলো টেনে টেনে মাটিতে ফেলতে লাগলো, দেবকুমার উঠে গিয়ে তার হাত চেপে ধরে বললো, কী হচ্ছে কী?

অনুরাধা তাকে ঠেলে দিয়ে বললো, তুমি আর আমাকে অপমান করতে এসো না। আমি আজই চলে যাবো—

ঠিক এই সময় পাশের ঘর থেকে বেশ জোরে একটা শব্দ হলো। তারপরই বুনবুনের কান্না। খাবার টেবিলের ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে খেলতে গিয়ে বুনবুন হঠাৎ নীচে পড়ে গেছে। দেবকুমার আর অনুরাধা দু'জনেই ছুটে গেল।

বাচ্চাদের এক ধরনের কান্না থাকে, আঁ করার পর মুখটা আর বন্ধই হয় না, চলতেই থাকে। এতখানি দম থাকে না বড়দের। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গায়কদের তানের চেয়েও লম্বা ভাবে কাঁদতে পারে শিশুরা। খুব আঘাত না পেলে বুনবুন কখনো কাঁদে না এতখানি।

অনুরাধা পক্ষীমাতার মতন ঝাঁপিয়ে এসে কোলে তুলে নিল বুনবুনকে। দেবকুমারও সাঙ্ঘাতিক ভয় পেয়েছে। বুনবুনের যতখানি ব্যথা লেগেছে, তার চেয়েও যেন বেশী ব্যথা বোধ হচ্ছে তার শরীরে।

অনুরাধার কোল থেকে দেবকুমার বুনবুনকে নিজে নিয়ে নিল।

অনুরাধা ব্যাকুল ভাবে বললো, ছাখো তো, মাথা কেটে গেছে নাকি? ইস, এই তো রক্ত পড়ছে।

অনুরাধাকে কাঁদাতে চেয়েছিল দেবকুমার, এই তো এখন জল গড়াচ্ছে অনুরাধার চোখ দিয়ে, বিশ্বজিতের দুর্ঘটনার খবর শুনেও সে এতখানি বিচলিত হয়নি।

বুনবুনকে আবার অনুরাধার কোলে দিতে গিয়ে একটু থেমে গেল দেবকুমার। কয়েক পলকের জন্য থেমে রইলো পৃথিবী। দু' জনের মধ্য দিয়ে বইতে লাগলো এক নীরব বাণীর স্রোত। যেন দু'জনেই বলতে লাগলো, কেন শুধু শুধু এই ঝগড়া, কেন শুধু শুধু ভুল বোঝা-বুঝি? তুমি কিংবা আমি কেউই বুনবুনকে ছেড়ে থাকতে পারবো না। বুনবুনের সামান্য কষ্টও আমরা সইতে পারি না। বুনবুনের জন্য আমাদের দুজনকেই অনেক কিছু মেনে নিতে হবে। সন্তানের জন্য বাবা মা-কে কত কী ছাড়তে হয়!

॥ ১২ ॥

শিক্ষক প্রিয়নাথ ও তাঁর পরিবারের সব ঘটনাই ঠিক এই ভাবে ঘটেছিল কিনা তা আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কিছু কিছু উপাদানের ওপর নির্ভর করে আমি কলমের খুশীতে এই কাহিনীটা গড়েছি।

যেমন, দেবকুমার একদিন আমাকে বলেছিল, জানেন সুনীলদা, আমি ছেলেবেলা থেকেই বাবাকে চিঠি লিখতাম, অনেক কথাই বাবাকে মুখে বলতে পারতাম না। স্কুলে একটি মাড়োয়াড়ীর ছেলে আমাকে একটা খুব সুন্দর কলম দিয়েছিল। কলমটা দিয়ে একটু

লিখতেই সে বলেছিল, তুই ওটা নিয়ে নে। আমি কিছুতেই নিতে চাইনি, কিন্তু ও জোর করে কলমটা আমার পকেটে গুঁজে দিল, ছেলেটা ছিল একটু পাগলাটে ধরনের, এই রকম ভাবে অনেককে অনেক জিনিস দিত। পরদিন সকালেই ছেলেটার বাড়ি থেকে ওর কাকা আর দু তিনজন লোক এসে হাজির আমাদের বাড়িতে। কলমটা ঐ ছেলেটার কাকার, ও না বলে এনেছিল। ওরা এসে আমার কাছে কলমটা চাইতেই আমার বাবা একেবারে অগ্নিমূর্তি ধরলেন। বাবা ভাবলেন, কলমটা আমি চুরি করেছি। কলমটা যখন ঐ ছেলেটার নিজের নয়, তখন ও আমাকে দেবে কী করে? সেই লোকজনের সামনেই বাবা আমাকে সাঙ্ঘাতিক ভাবে মারলেন। কোনো কথাই শুনতে চাইলেন না। আমার এমন অপমান, এমন মনে ব্যথা লেগেছিল যে ভেবেছিলাম আত্মহত্যা করবো। তার আগে সব কথা খোলাখুলি ভাবে একটা চিঠিতে লিখে জানিয়ে আমি বাবার বালিশের তলায় রেখে দিয়েছিলাম।

সুতরাং পরবর্তী জীবনেও দেবকুমার তার বাবাকে আবার চিঠি লিখতেই পারে।

অনুরাধাকে আমি অনেকবার অনেক ভাবে দেখেছি। এই মেয়েটির চরিত্রের অনেকগুলি দিক আছে। ওদের দাম্পত্য কলহের বেশ কিছু টুকরো আমার কানে এসেছে। অনেক সময় আমি নিঃসাড়ে আমাদের বাথরুমের জানলার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের কথাবার্তা শুনতাম। অন্যের জীবনে গোপনে উঁকি মারা আমার বিশেষ শখ।

প্রিয়নাথ স্যাররা সত্যি সত্যি পুরোনো বাড়ি ছেড়ে বস্তিতে উঠে যাওয়ার খবর পেয়ে আমি নিজে একবার সেই বস্তিটা দেখতে গিয়েছিলাম। চোরের মতন বা গোয়েন্দার মতন লুকিয়ে। অচেনা এলাকায় কোনো লোকের পক্ষে কোনো বস্তির মধ্যে ঘোরাফেরা করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। আমার রীতিমতন ভয় ভয় করছিল। সি এম ডি এ ঐ বস্তিটার মধ্যে কয়েকটা স্যানিটারি প্রিভি এবং গোটা চারেক টিউবওয়েল বসিয়ে দিয়েছে, তবুও ঐ বস্তির বাচ্চারা যথারীতি

রাস্তার ধারে উলঙ্গ হয়ে বসেই প্রাকৃতিক কাজগুলি সারে। ঐ বস্তিতে সবচেয়ে বেমানান লেগেছিল জাপানীকে। সে একটা সরল সুন্দর যুবতী, কিন্তু তাকে বস্তি থেকে সেজেগুজে বেরুতে দেখলেই লোকে ভাবে খারাপ মেয়ে, এবং তার উদ্দেশ্যে কু কথা ছুঁড়ে দেয়। এই ব্যাপারটা বড় নিষ্ঠুর, প্রিয়নাথ স্যার নিজের অন্ধ গোয়াতুর্মিতে এদিকটা চিন্তাই করেননি।

এই কাহিনীর একটি পরিসমাপ্তির জন্য আমি খুব চিন্তায় পড়েছিলাম। মানুষের জীবন কাহিনী অনবরত চলতেই থাকে, তার মধ্যে এক একটা মৃত্যু এক একটা পরিচ্ছেদ। কিন্তু লেখককে তো কোনো এক জায়গায় থামতেই হয়, এবং সেই থামাটার মধ্যে একটা যুক্তির সামঞ্জস্য থাকা দরকার। আমার অন্য একটি উপন্যাসে আমি কাহিনী হঠাৎ মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলেছিলাম, এর পর ওদের জীবনের গল্প আরও চলতে থাকবে, কিন্তু লেখককে তো সবটুকু জানিয়ে দেবার দায়িত্ব কেউ দেয়নি। অবশ্য বারবার ওরকম ভাবে উপন্যাস শেষ করা যায় না।

যাই হোক, আমি একটা সুখ সমাপ্তিই চাইছিলাম। মানুষের বেদনা ও অভাব আমার বেশিক্ষণ সহ্য হয় না। দারিদ্র্য জিনিসটা অত্যন্ত নোংরা। আমি নিজে এক সময় চরম দারিদ্র্য ভোগ করেছি বলেই ওর স্বরূপ জানি। দারিদ্র্য মানুষের মনটাকেও ছোট করে দেয়। চরিত্রগুলিকে পরম দুঃখ কষ্টের মধ্যে ফেলে দিয়ে ঔপন্যাসিকের কায়দা দেখানোর ব্যাপারটা আমার ঠিক ধাতে আসে না।

এ কাহিনীর কতটা বাস্তব আর কতটা মন গড়া তা তো আর পাঠক পাঠিকাদের জানবার কথা নয়। সুতরাং আমি ইচ্ছে করলেই এই দুঃখী মানুষগুলিকে আবার সুখী করে দিতে পারি। শুধু ব্যাপারটাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা দরকার।

প্রিয়নাথ-কল্যাণী-জাপানী-টোটোকে আমি বস্তিতে রাখতে চাই না। এমনিতেই বাস্তব বস্তিগুলিতে বহু দুঃখী মানুষ থাকে, সেখানে আর ভিড় বাড়াবার দরকার নেই। কিন্তু কী ভাবে ওদের ফিরিয়ে

আনা যায়? প্রিয়নাথের আত্মসম্মান ভেঙে গুঁড়িয়ে তাঁকে একটা পরাজিত জবুথবু মানুষ হিসেবে বস্তি থেকে ফিরিয়ে আনার কোনো মানে হয় না। সাধারণ হাজারটা এলেবেলে মানুষের মধ্যে দু একজন জেদী মানুষই মনুষ্য জীবনকে খানিকটা সার্থকতা দিয়ে যায়।

আমার ধারণা একমাত্র অনুরাধাই যথার্থভাবে আবার পুনর্মিলন ঘটাতে পারে। আমি জানি, সে দারুণ বুদ্ধিমতী এবং এই পরিবারে তার শ্বশুর ছাড়া একমাত্র তারই, যাকে বলে ইনিসিয়েটিভ, তাই আছে। কিন্তু আকস্মিকভাবে বিশ্বজিতের দুর্ঘটনার খবরটি আসায় সে আবার নিজেকে বইয়ের জগতে ডুবিয়ে দিয়েছে। কয়েকদিন তাকে আর বাড়ি থেকে বেরুতেই দেখি না। আমি অবশ্য, খবরের কাগজে রোজই লক্ষ্য রাখছি, বিশ্বজিতের মৃত্যু সংবাদ বেরোয়নি। সে বেঁচে থাকলে অবশ্য সেটা আর খবর হিসেবে বিবেচিত হবে না। অর্থাৎ নো নিউজ ইজ গুড নিউজ।

হঠাৎ টোটো একটা কাণ্ড বাধিয়ে পরিসমাপ্তি টেনে আনলো।

এদের মধ্যে আমি টোটোকেই সবচেয়ে কম চিনি। দু একবার দেখেছি মাত্র। জাপানী প্রায়ই আসে তার বউদির সঙ্গে দেখা করতে, সুতরাং আমারও দেখা হয়ে গেছে। তার মুখমণ্ডলেই তার চরিত্র লেখা আছে। তা ছাড়া, অনুরাধা অনেকদিন আগে জাপানীকে একবার আমাদের বাড়িতে নিয়ে এসেছিল আলাপ করিয়ে দেবার জন্য। জাপানীর সাহিত্য প্রীতি নেই, সে আমার লেখাটেখা কিছু পড়েনি, নাম শুনেছে মাত্র। কিন্তু তিমির দাশগুপ্তের চোখ আছে, জাপানী অভিনয়টা ভালোই পারবে।

টোটোর ব্যাপার আলাদা। অল্প বয়েসী বালক হলেও সে এরই মধ্যে নানান অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছে। তার মনের গড়নটা বাইরে থেকে খুব সহজে ধরা যায় না। খুন, পুলিশ, অজ্ঞাতবাসের মধ্য দিয়ে যে যায়, সে কি কখনো চুপচাপ সাধারণ জীবন কাটাতে পারে? তাছাড়া বাবার কাছ থেকে সে একটা গুণ অন্তত পেয়েছে, তাঁর জেদ। টোটো সম্পর্কে আমি খুব বেশী কিছু জানি না বলেই আমি তাকে

নিয়ে আলাদা কোনো পরিচ্ছেদ লিখিনি।

এবার টোটোর শেষতম কীর্তিটি সবিস্তারে বলা দরকার।

আর্মি এনরোলমেণ্টে টোটো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল এবং তার স্বাস্থ্যও চমৎকার। অফিসাররা তাকে সাগ্রহে লুফে নিতে রাজি ছিলেন কিন্তু টোটো পুলিশ ক্লিয়ারেন্স পেল না। সরকারের কাছ থেকে সর্বজনীন ক্ষমা পেলেও খাতায় নাম উঠে আছে, এই সব দাগী ছেলে-দের কাজ পাবার পক্ষে অনেক রকম বাধা রয়েই গেছে। বিশেষত আর্মিতে কাজ। খাতা থেকে নাম মুছে ফেলার অনেক চেষ্টা করেছিল টোটো, কিন্তু পারলো না।

তার তরুণ হৃদয় রাগে অভিমানে ফুঁসে উঠলো এবং তার প্রতি-শোধ এক বিচিত্র পথ নিল।

পড়ার বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে সে চুপচাপ খাটে শুয়ে থাকে। এই মশা, এই গরম, এই অন্ধকার, এর মধ্যেই তাকে থাকতে হবে? সব সময় একটা বুক চাপা দুর্গন্ধ। টোটো ভুরু কুঁচকে দাঁতে দাঁত চেপে মনে মনে গরগর করে।

মা খেতে ডাকলে সে গর্জে উঠে বলে খাবো না।

ছোড়দির সঙ্গে সে অকারণে ঝগড়া বাধায়। তার চোখ মুখ দেখলেই বোঝা যায়, দিন দিন সে বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। সে এই জীবন মেনে নেবে না।

একদিন সে একটা টিন এনে লুকিয়ে রাখলো তার খাটের নীচে। তারপর শুয়ে শুয়ে সে সমস্ত আর্মি অফিসারদের ঘৃণা করতে লাগলো। কয়েকদিন আগেও সে মনে মনে সব সময় একটা ছবি এঁকেছে, পায়ে ভারী বুট, অলিভ গ্রীন প্যাণ্ট ও শার্ট পরা, কোমরে চওড়া বেল্ট, স্ট্র্যাপে রিভলবার গোঁজা, এই রকম চেহারায় সে একলা হাঁটছে দেরাদুনে। পাহাড়ের নীচে তার কোয়ার্টার, পাশাপাশি আরও তিনটে কোয়ার্টারে তার তিন বন্ধু থাকে।

চটাস চটাস করে মশা মারতে মারতে টোটো সেই ছবিটাকে মনের মধ্যে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে লাগলো।

মাঝ রাত্তিরে, সবাই যখন ঘুমন্ত, তখন টোটো নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়লো সেই টিনটা হাতে নিয়ে। সেটাতে পেট্রোল ভরা। ছলাৎ ছলাৎ করে সে পেট্রোল ছিটিয়ে যেতে লাগল এক একটা ঘরের দেওয়ালে। যেন এগুলো সবই আর্মি ক্যাম্প।

তারপর বস্তিটার দক্ষিণ পশ্চিম দিকে যে ঘরটা খালি সেটা থেকে লোক উঠে গেছে কয়েকদিন আগে, টোটো আগেই লক্ষ্য করেছিল, সেই ঘরটায় বাকি পেট্রোলটুকু সব ঢেলে সে দেশলাই কাঠি জ্বেলে দিল।

সে বলেছিল সে যখন আর্মিতে রেভোলিউশান করিয়ে মার্চ করে কলকাতায় ফিরবে, সেদিন একটাও বস্তি থাকবে না। সেরকম যখন হলো না, তখন একটা বস্তি তো অন্তত শেষ হোক। সে দেখতে চায় একবার একটা বস্তি পুড়লে সেখানে আবার নতুন বস্তি গজিয়ে ওঠে কিনা।

বস্তির মধ্যে আগুনের কোনো মার নেই। কাঠ, বাঁশ, দর্মা ইত্যাদি আগুনের যাবতীয় লোভনীয় খাদ্য এখানে প্রস্তুত। সুতরাং আনন্দে আগুনের শিখা উঠলো লকলকিয়ে।

ঘুম ভাঙা মানুষের ভয়ার্ত চিৎকারে কান পাতা যায় না। দারুণ হুড়োহুড়ি ও ঠ্যালাঠেলি। একটা সুবিধে এই বস্তির অধিকাংশ মানুষেরই যথাসর্বস্ব নামের জিনিসগুলো খুব ভারি না, তাই সেগুলো অনায়াসেই ঘর থেকে বার করে বড় রাস্তায় এনে ফেলা যায়। টোটো নিজেও অসুর বিক্রমে তার মা বাবাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এলো বাইরে। চ্যাঁ ভ্যাঁ করা কাচ্চাবাচ্চাগুলোকে প্রায় ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো রাস্তায়।

এত রাত্রেও জীবন্ত হয়ে এলো এলাকা। লোকজন সবাই প্রায় বাইরে আসতে পেরেছে এবং স্ত্রীলোকেরা ডুকরে কাঁদছে। কল্যাণী হঠাৎ বলে উঠলেন, সেই বুড়ো মানুষটি? আমাদের পাশের ঘরের সেই বুড়ো মানুষটি, সে বোধহয় বেরোতে পারেনি!

যে লোকটির জীবনের কোনো মূল্যই নেই, তার জন্যই কল্যাণী ব্যাকুল।

টোটো মাকে খুশী করার জন্য আগুনের মধ্যে ছুটে গিয়ে চেতনা-হীন সেই বৃদ্ধকে নিয়ে এলো ঘাড়ে করে।

আগুনের কী সুন্দর দৃশ্য। একটা ঘর থেকে অন্য ঘরে লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছে আগুন। দু চারজন বোকা লোক বালতি করে জল ছেটাতে গিয়ে ফিরে এলো ভয় পেয়ে। কলকাতার অন্ধকার আকাশকে উজ্জ্বল করে চলতে লাগলো আগুনের সমারোহ। যেন খাণ্ডবদাহনের পর অগ্নি আর কখনো এমনভাবে তৃপ্ত হননি।

দমকল এলো প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাদে। তাদের অবশ্য খুব বেশী পরিশ্রম করতে হবে না। ততক্ষণে আগুন তার খিদে প্রায় মিটিয়ে নিয়েছে।

এরপর প্রিয়নাথ তার স্ত্রী পুত্র কন্যার হাত ধরে কোথায় যাবেন সে অন্য গল্প।